

বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান ষষ্ঠি শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন

অধ্যাপক ড. সফিউর রহমান

অধ্যাপক এস এম হায়দার

অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহানআরা

অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান

মোহাম্মাদ নূরে আলম সিদ্দিকী

ড. মোঃ আব্দুল খালেক

গুল আনার আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি গঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনক সমাজ গঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাঝে তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সূজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। ঘষ্ট শ্রেণির এই পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানমনক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীর সূজনশীলতা ও কল্পনা বৃদ্ধির জন্য হাতেকলমে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয় হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। প্রবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব অণ্টিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল করীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

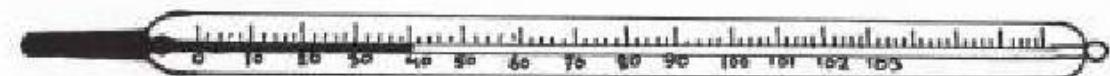
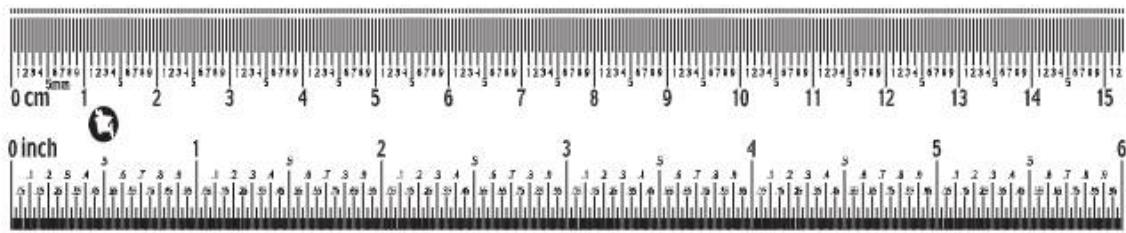
সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বৈজ্ঞানিক অক্ষিয়া ও পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	জীবজগৎ	১১
তৃতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	২১
চতুর্থ	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২৮
পঞ্চম	সালোকসংশ্লেষণ	৩৮
ষষ্ঠ	সংবেদী অঙ্গ	৪২
সপ্তম	পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব	৫০
অষ্টম	মিশ্রণ	৬০
নবম	আলোর ঘটনা	৭৩
দশম	গতি	৮২
একাদশ	বল এবং সরল যন্ত্র	৯৩
দ্বাদশ	পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন	১০৩
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১১৩
চতুর্দশ	পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন	১২৪

প্রথম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের উভয়ের উভয়ের খুঁজতে হয়। এগুলো হলো, তোমার উচ্চতা কত? তোমার ওজন কত? এখন কয়টা বাজে? আজকে বাতাসের তাপমাত্রা কত? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য দরকার উচ্চতা, ওজন, সময় এবং তাপমাত্রার মাপজোখের। দৈনন্দিন জীবনে এই মাপজোখের উপর আমরা নানাভাবে নির্ভরশীল। এই মাপজোখের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করে থাকি। আর এই কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ঘটনায় এই পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত। যেমন, বাজার থেকে চাল কিনে আনতে, রান্নার জন্য তেলের ব্যবহারের সময়, জামাকাপড় তৈরি করার সময়।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মৌলিক ও যৌগিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারব;
- বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব;
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করতে পারব;
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।

পাঠ ১ : বিজ্ঞান কী?

‘বিজ্ঞান’ শব্দটির অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞান কী, তা জানো? কোনো বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত ও দক্ষতা, এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি - এই সব মিলিয়েই হয় সেই বিষয়ে জ্ঞান। বিজ্ঞান তাহলে কোন বিষয়ে জ্ঞান? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান। তোমরা এর আগে বিভিন্ন জীব ও জড়বস্তু সম্বন্ধে জেনেছ। আবার, নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও জেনেছ, কীভাবে বৃষ্টি হয়, উড়িদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে, ইত্যাদি। এ সবই বিজ্ঞানের অংশ।

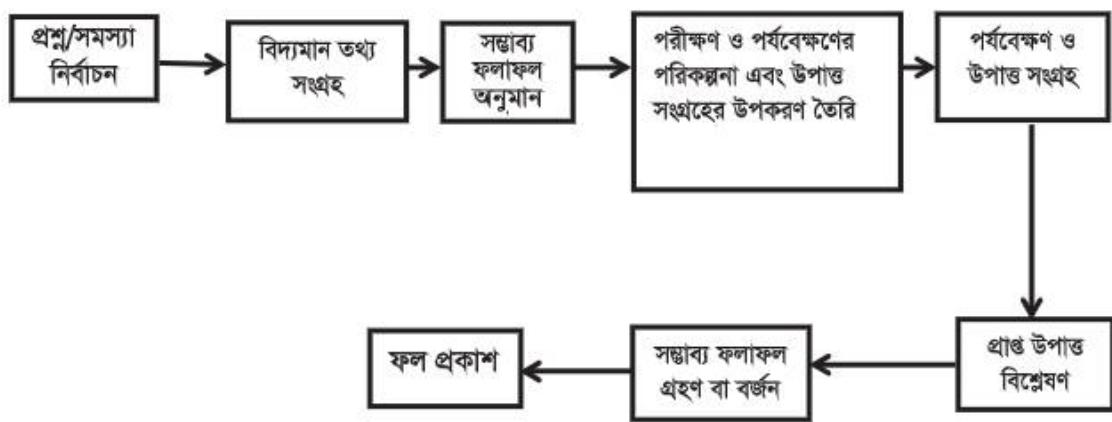
তবে প্রকৃতি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য বা উপলব্ধি বিজ্ঞান নয়। কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়, তা বিজ্ঞান হবে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে হলে তাকে হয় তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে পেতে হবে অথবা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে হয়ত তোমরা গল্লাকারে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছ। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান? না, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়। কারণ, এসব ব্যাখ্যা পরীক্ষা থেকে পাওয়া নয় বা কোনো পরীক্ষা এদেরকে সমর্থন করে না।

এই জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি। এগুলো বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া। জ্ঞান যেমন বিজ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াও বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দরকার, তেমনি দরকার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, অর্থাৎ যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার মনোভাব। অপরের মতামতের মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্মৃকার করা এক্ষেত্রে জরুরি। একে বিজ্ঞানমনস্ফ দৃষ্টিভঙ্গীও বলে। বিজ্ঞানকে তাহলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত, এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের কি একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে? না। একাধিক উপায়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। তবে তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। সে মিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।



প্রবাহচিত্র: বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পাঠ ২-৩ : পরীক্ষণ

পরীক্ষণ হলো বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোজার জন্য একজন বিজ্ঞানী প্রথমে জানা বা বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে ঐ অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করেন। পরীক্ষণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর আবার তা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করেন। অধিকাংশ পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপসহ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

পরীক্ষণ : বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি দরকার কিনা তাৰ পরীক্ষা।

পরীক্ষণটি কৰতে যা যা দরকার : ছোটো দুটি পাত্র, ফুলগাছের দুটি চারা, পানি ও শুকলা মাটি।

পদ্ধতি :

১. **সমস্যা নির্ধারণ :** পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রথম ধাপে তোমরা সমস্যা স্থির কৱলে—ফুলগাছের চারা তুলে এনে লাগালে মারা যাচ্ছে কেন?

২. **জানা তথ্য সংগ্রহ :** তোমরা বই পড়ে, শিক্ষককে বা পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা কৱে জানার চেষ্টা কৱলে কেন চারাগাছ মারা যেতে পাৰে। তোমরা জানলে যে পানি না পেলে চারাগাছ মারা যেতে পাৰে।

৩. **আনুমানিক/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (সম্ভাব্য ফলাফল) :** জানা তথ্য থেকে তোমরা অনুমিত সিদ্ধান্ত নিলে-পানিৰ অভাবে চারাগাছ মারা যায়।

৪. **পরীক্ষণের পরিকল্পনা :** এবার তোমরা পরীক্ষণের পরিকল্পনা কৱলে। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের দুটি পাত্রে দুটি গাছ নিতে হবে। তোমরা কেবল দুটি পাত্রের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রাখতে পাৱবে। অন্য সব কিছু সমান সমান রাখতে হবে। না হলে তোমরা যেটি যাচাই কৰতে চাও, তা কৰতে পাৱবে না।

৫. **পরীক্ষণ :** ছোটো দুটি একই রকমের পাত্র নাও। মাটি বা প্লাস্টিকের টবজাতীয় পাত্র হলে ভালো হয়। পাত্র দুটির তলায় ছোটো ছিদ্র কৰ। এবার শুকলা মাটি দিয়ে পাত্র দুটি ভৱে দাও। এবার একই ধৰনের দুটি চারাগাছ দুই পাত্রে রোপণ কৰ। একটিতে পানি দাও আৰ একটি শুকলো রাখ। দুটি গাছকে ছায়ায় রেখে দাও। পৰেৱে দিন গাছ দুটিকে পর্যবেক্ষণ কৰ। একটি গাছ প্রায় মৰে গেছে, অন্যটি সতেজ আছে। তাই না?

৬. **উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** দুটি পাত্রে একই ধৰনের মাটি ছিল। চারাগাছ দুটিকে পাত্রসহ একই জায়গায় রাখা হয়েছিল। তাদেৱ মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল পানি। একটিতে পানি দেওয়া হয়েছিল, আৰ অন্যটিতে পানি দেওয়া হয়নি। এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, পানি না দেওয়ায় একটি চারা গাছ মারা গেছে।

৭. **ফল প্রকাশ :** তোমরা তোমাদেৱ পরীক্ষণেৱ ফল বিদ্যালয়েৱ বুলেটিন বোর্ডে লিখে প্রকাশ কৰতে পাৱ। উপরোক্ষিত ধাপগুলো হলো পরীক্ষণ পদ্ধতিৰ ধাপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰও ধাপ।

পাঠ ৪-৫ : পরিমাপেৱ প্ৰয়োজনীয়তা

আমরা অনেক সময়ই জ্ঞান-জ্ঞানা নানাবিধ ঘটনাতে আন্দজ কৰে পরিমাপ কৰে থাকি। যেমন: তোমাৰ পড়াৰ টেবিলেৱ দৈৰ্ঘ্য কত? তুমি কখন স্কুলে রওনা দিবে? এই সকল ক্ষেত্ৰে প্রায়ই তোমরা আন্দজ কৰে পরিমাপ কৰাৰ চেষ্টা কৰ।

আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেমন: বাজার থেকে ঢাল, ডাল কিনতে; জামা-কাপড় তৈরি করতে কিংবা সময়মতো ক্লাস শুরু ও শেষ করতে আমাদের যথাযথ পরিমাপ দরকার। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত একটি শ্রেণিকক্ষে কয় জোড়া টেবিল- বেঞ্চ রাখা যাবে, বাড়ির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কয়টা ঘর তৈরি করা যাবে, এমনকি কোন কক্ষের আকৃতি কী রকম হবে তা বলা মুশকিল হবে। এছাড়া তরকারি রান্নার সময় পরিমাণমতো বিভিন্ন একার মসলা ব্যবহার করা খুবই জরুরি। জীবন বাঁচানোর যে ক্ষেত্র তাও তৈরি করতে হয় পরিমাণ মতো এবং খেতেও হয় পরিমাণ মতো। এক কথায় দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

কাজ : দৈনন্দিন জীবনের দশটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটি তালিকা তৈরি কর, যাতে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন।

পরিমাপের একক

কাজ : এক খণ্ড রশি (প্রায় ২০ ফুট) নিয়ে এটিকে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা করে নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে কি দেখতে পাবে? কার হাতে কত হাত হলো? যেহেতু তোমাদের প্রত্যেকের হাতের মাপ ভিন্ন, তাই নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে রশিটির দৈর্ঘ্য একেকজনের বিবেচনায় একেকের বকম হবে।

এক্ষেত্রে হয়ত দেখবে, একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৬ হাত এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৭ হাত। উপর্যুক্ত কাজটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কীভাবে এই পার্থক্য দূর করা যায়? মূলত এই পার্থক্য দূর করার জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হয়। কোনো একটি সুবিধাজনক মূল্য অংশকে এই আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের পরিমাণই পরিমাপের একক। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। নিজ নিজ নানা আদর্শ মানের সাথে তুলনা করেই সাধারণত দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি রাশি পরিমাপ করা হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিমাপকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধর তুমি একটি কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপছ। দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর তুমি বলছ ১০ মিটার। তুমি যদি কেবল ১০ বল তা কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা ও একটি এককের প্রয়োজন।

কাজ : তোমাদের (কমপক্ষে ১০ জন) নিজ নিজ পা দিয়ে শ্রেণি কক্ষের দৈর্ঘ্য মেপে তা একটি নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করো।

পাঠ- ৬ : মৌলিক ও যৌগিক একক

আমরা যা পরিমাপ করি, তাকে সাধারণত রাশি বলি। যেমন: টেবিলের দৈর্ঘ্য একটি রাশি, উচ্চতা একটি রাশি। এই রাশিগুলো পরিমাপের জন্য বিভিন্ন রকমের একক আছে। যে কোনো একক দ্বারা কোনো কিছুকে সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন: এককের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

দৈর্ঘ্যের একক, ভরের একক, সময়ের একক, তাপমাত্রার একক, বিদ্যুৎ প্রবাহের একক, আলোক ওজ্জ্বলের একক ও পদার্থের পরিমাণের একক, এই সাতটি একককে বর্তমানে মৌলিক একক হিসেবে ধরা হয়। অন্য কোনো রাশিকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কেবল একটি মৌলিক একক দ্বারা এর পরিমাপকে প্রকাশ করা যায় না। যেমন: একটি শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের দুটি এককের গুণফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। আয়তনের ক্ষেত্রে তিনটি এককের গুণফল দরকার। এই সমন্বিত এককই হলো যৌগিক বা লক্ষ একক। যেমন: ক্ষেত্রফলের একক হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এককের গুণফল। অনুরূপভাবে আয়তনের একক হলো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার এককের গুণফল। বেগের একক হলো দৈর্ঘ্যের একক ও সময়ের এককের অনুপাত।

এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয়ের বিভিন্ন একক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন: তোমার উচ্চতা কত? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত আমরা বলি ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। আবার জাতীয় নিবন্ধন ফরম বা পাসপোর্টের ফরম পূরণের সময় আমরা লিখেছি ১ মিটার ৬১ সেন্টিমিটার। এর মানে কী? একই পরিমাপের জন্য আমরা প্রচলিত বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। এগুলো এমকেএস (মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড), এফপিএস (ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড) ও সিজিএস (সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড) পদ্ধতি নামে প্রচলিত। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অথাঁৎ একই রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হত। এককের এই বিভিন্নতার কারণে উচ্চত নানা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সাল থেকে পৃথিবীর সকল দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটিকে এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সকল ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট একক নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেন্ড, তাপমাত্রার একক কেলভিন, বিদ্যুৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার আলোক ওজ্জ্বলের একক ক্যান্ডেলা ও পদার্থের পরিমাণের একক মোল। এগুলো বর্তমানে এস.আই. পদ্ধতির মৌলিক একক।

দৈর্ঘ্যের একক

বর্তমানে দৈর্ঘ্য পরিমাপে আন্তর্জাতিক একক হলো মিটার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ১৮৭৫ সালে একত্রে বসে দৈর্ঘ্যের এক মিটারের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তাঁরা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম নামক মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দঙ্গের দুই থান্টে দুটি দাগ দেন। শূন্য ডিফ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই দুটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তাঁরা এক মিটার হিসেবে নির্ধারণ করেন।

দৈর্ঘ্যের এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

আমরা যখন কাপড়, চেবিলের দৈর্ঘ্য কিংবা কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপি, তখন ‘মিটার’ এককটি ব্যবহার করি। কিন্তু একটি পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যবহার করি সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সেমি)। আবার আমরা যখন একটি পর্যসার পুরুত্ব মাপতে যাব, তখন আমরা কিন্তু এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করে থাকি। এটি হলো মিলিমিটার (সংক্ষেপে মিমি)।

অন্যদিকে আমরা বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে (যেমন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব) ব্যবহার করি কিলোমিটার (সংক্ষেপে কিমি)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারের প্রয়োগ খুবই বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো-

১ কিলোমিটার	=	১০০০ মিটার
১ মিটার	=	১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার	=	১০ মিলিমিটার

পাঠ-৭ : ভরের একক

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো কিলোগ্রাম। সংক্ষেপে এটি কেজি হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সের সেভরেসে অবস্থিত ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে সংরক্ষিত একটি দণ্ডের ভরকে একেব্রে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়েছে। কম ভরের জন্য ব্যবহৃত একক হলো গ্রাম। এ ছাড়া বেশি ভরের বস্তু পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।

১ মেট্রিক টন =	১০ কুইন্টাল ;	১ কুইন্টাল =	১০০ কিলোগ্রাম
১ কিলোগ্রাম =	১০০০ গ্রাম ;	১ গ্রাম =	১০০০ মিলিগ্রাম

সময়ের একক

একটু আগের বর্ণিত সকল পদ্ধতিতে সময়ের একক হলো সেকেন্ড। তবে দৈনন্দিন জীবনে সেকেন্ডের চেয়ে এর গুণিতাংশের এককগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে এসে একই অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে, সেটি হলো ১ দিন। এক দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হলো ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো ১ মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগই হলো আমাদের মৌলিক একক সেকেন্ড। সুতরাং,

১ দিন =	২৪ ঘণ্টা
১ ঘণ্টা =	৬০ মিনিট
১ মিনিট =	৬০ সেকেন্ড

পাঠ ৮-৯ : দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

কাজ : প্রথমে সাদা কাগজে একটি সরল রেখা টান। এবার রেখাটির উপর একটি রুলার স্থাপন কর। রেখাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার ঢোক যেন সঠিক অবস্থানে থাকে।



চিত্র ১.১ : দৈর্ঘ্য পরিমাপ

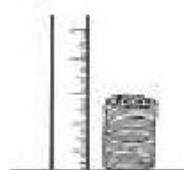
কাজ : কয়েকটি ৫০ পয়সার মুদ্রা একত্রে চিত্রের

মতো করে রেখে এর উচ্চতা নির্ণয় কর।

সর্বমোট মুদ্রার সংখ্যা =

মোট উচ্চতা =

একটি মুদ্রার পুরুষ্ট =



চিত্র ১.২ : পয়সার পুরুষ্ট নির্ণয়

ভরের পরিমাপ

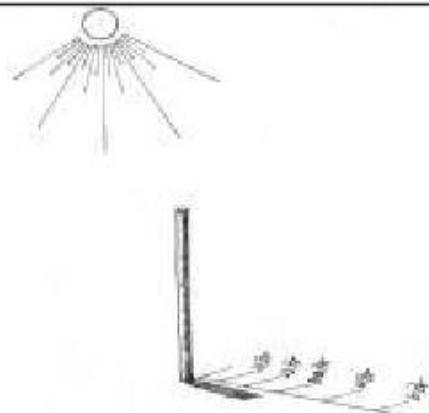
কাজ : একটি দাঁড়ি পাল্লায় বাম পাল্লায় ১০০ থামের একটি বাটখারা রাখ। এবার ডান দিকে একটির পর একটি মার্বেল দিতে থাক যতক্ষণ না বাম ও ডান পাল্লা সাম্যবস্থায় আসে।

..... টি মার্বেলের ভর = ১০০ থাম

অতএব, ১টি মার্বেলের ভর = গ্রাম

সময়ের ক্রমাংশন/দাগাঙ্কন

কাজ : ছবির মতো ক্লুলের সামনের মাঠে রৌদ্রের মধ্যে একটি লাঠি খাড়া করে বসিয়ে দাও। লক্ষ করলে দেখবে খাড়া কাঠিটির ছায়া পড়েছে। ঐ ছায়ার প্রান্তে এবার একটি দাগ দাও এবং ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ক্লাসের পরে গিয়ে পুনরায় ছায়ার প্রান্তে দাগ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এভাবে প্রতি ঘণ্টার পরপর দাগ দিয়ে একটি সূর্যঘড়ি তৈরি কর যা দ্বারা ছায়া দেখে সময় বলে দিতে পারবে।



চিত্র ১.৩ : সূর্যঘড়ি

পাঠ- ১০ : ক্ষেত্রফল ও তার পরিমাপ

তুমি তোমার ঘষ্ট শ্রেণির গণিত বইটি তোমার পড়ার টেবিলে রাখ। এখন একটু দেখার চেষ্টা কর এ রকম মোট কয়টি বই পড়ার টেবিলটিতে পাশাপশি রাখা যাবে। আবার এও কি বলতে পারবে যে তোমার পড়ার টেবিলটির সমান কয়টি টেবিল তোমার পড়ার কক্ষে রাখা যাবে? চিন্তা করছ যে, এই হিসাব তুমি কীভাবে বের করবে? আসলে এটি বোবার জন্য তোমাকে তোমার পড়ার টেবিলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে টেবিলের পৃষ্ঠা বা ঘরের মেঝে কতটুকু ক্ষেত্র দখল করে আছে তা জানা যাবে। আয়তাকার ক্ষেত্রের এই পরিমাপ করতে হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

$$\text{আয়তাকার ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$$

পাঠ-১১ : আয়তন ও তার পরিমাপ

সাধারণভাবেই বোবা যায় যে তোমার জ্যামিতি বাস্তুটি তোমার বিজ্ঞান বইয়ের তুলনায় কম ছান দখল করে। আবার একটি ইট যে জায়গা দখল করে দুটি ইট তার চেয়ে বেশি ছান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যে ছান দখল করে তাকে ঐ বস্তুর আয়তন বলে। ফলে আমরা বলতে পারি, জ্যামিতি বাস্তুটির আয়তন বিজ্ঞান বইয়ের আয়তনের চেয়ে কম কিংবা একটি ইটের আয়তন দুটি ইটের আয়তনের তুলনায় কম। আয়তাকার একটি ঘনবস্তুর আয়তন বের করতে হলে ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করতে হয়।

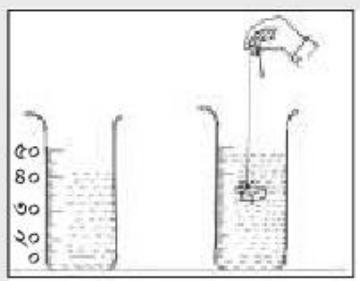
$$\text{আয়তন} = \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা}$$

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘনমিটার। ১ মিটার দৈর্ঘ্য, ১ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘনকের যে জায়গা দখল করে তা হলো ১ ঘনমিটার। $1 \text{ ঘনমিটার} = 1 \text{ মিটার} \times 1 \text{ মিটার} \times 1 \text{ মিটার}$ । সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার। একে সংক্ষেপে সিসি (cubic centimetre) বলে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। $1000 \text{ সিসি} = 1 \text{ লিটার}$ । এক সিসিকে এক মিলিলিটারও বলা হয়। $1 \text{ লিটার} = 1000 \text{ সিসি} = 1000 \text{ মিলিলিটার}$ ।

বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ

- ১^১ যে কোনো আয়তাকার ঘনবস্তু যেমন ইট বা ঘরের আয়তন সহজেই এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেঝে গুণ করে বের করা যায়। কিন্তু অন্য আকৃতির কোনো বস্তু বা অসমতল বস্তুর আয়তন কীভাবে বের করব?

কাজ : সুতা দিয়ে আয়তাকার একটি ইটের টুকরা বাঁধ। এবার মাপচোঙে কিছু পানি নিয়ে তার আয়তনের পাঠ নাও। এবার সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে আয়তাকার ইটের টুকরোটিকে মাপচোঙের মধ্যে ডুবাও এবং পুনরায় পাঠ নাও। দুটি পাঠের পার্থক্য থেকে আয়তাকার ইটের টুকরার আয়তন বের করা যায়। এবার কেলের সাহায্যে আয়তাকার ইটের টুকরোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর আয়তন মিলিয়ে নাও। এবার অন্য দুটি অসম কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এদের পৃথকভাবে মাপচোঙের পানির মধ্যে ডুবাও। এবার আলাদা আলাদাভাবে পাঠ নিয়ে এদের আয়তন নির্ণয় কর।

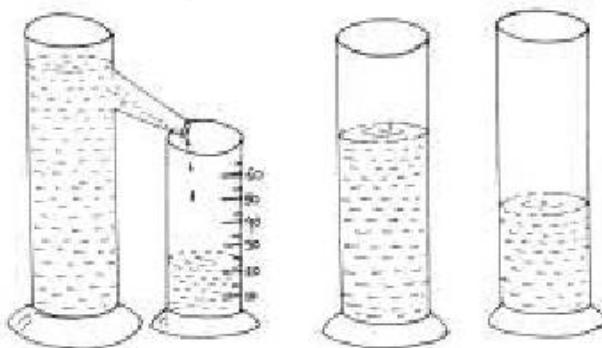


চিত্র ১.৪ : মাপচোঙ

সাবধানতা : মাপচোঙের পাঠ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। **প্রথমত:** মাপচোঙটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা রাখতে হবে। **দ্বিতীয়ত:** পাঠ নেওয়ার সময় চোখকে পানির সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে।

পাঠ-১২ : তরল পদার্থের আয়তন নির্ণয়

আমরা সাধারণত তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য একটি দাগাঙ্কিত মাপচোঙ ব্যবহার করে থাকি। নিচের দাগাঙ্কিত মাপচোঙটির সাহায্যে অন্যান্য সিলিন্ডারের তরলের আয়তন পরিমাপ করে খাতায় লিখ।

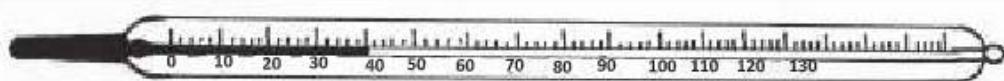


চিত্র ১.৫ : তরল পদার্থের আয়তন

তাপমাত্রার পরিমাপ

তুমি হয়ত বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা শব্দটির সাথে পরিচিত। যেমন : টেলিভিশন অথবা রেডিওর থবরে চলতি দিনের বাতাসের তাপমাত্রা বলে দেওয়া হয়। তাছাড়া কারো জ্বর হলে আমরা তার দেহের তাপমাত্রা মেপে জেনে নিই। তাপমাত্রা পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক হলো কেলভিন। তবে এখনও সারা বিশ্বে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ করে দৈনিক তাপমাত্রা নির্ণয়ে বা জ্বর নির্ণয়ে সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট একক দুটি বহুল ব্যবহৃত।

কাজ : প্রথমে একটি ডাক্তারি থার্মোমিটারের নাও। এবার এর সাহায্যে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হয় তা বুঝো নাও। সাধারণত থার্মোমিটারের গায়ে ফারেনহাইট স্কেলে ৯৪-১০৮ দাগাক্ষিত করা থাকে। কোনো থার্মোমিটারে আবার একই সাথে সেলসিয়াস স্কেলে ৩৫-৪২ দাগাক্ষিত করা থাকে। এবার লক্ষ করে দেখবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটি পারদস্ত দেখো যাচ্ছে। এটি তাপমাত্রার বৃক্ষির সাথে সাথে ক্ষেলের উচ্চতর মানের দিকে এগোতে থাকে। এবার তুমি থার্মোমিটারটিকে হাতের নিচে বা তোমার জিহ্বার নিচে রেখে দিলে ১ মিনিট পর দেখতে পাবে পারদস্তের উচ্চতার কোনো পার্থক্য হয়েছে কিনা। এ থেকে তুমি তোমার শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবে।



চিত্র ১.৬ : থার্মোমিটার

নতুন শব্দ : পরিমাপ, মৌলিক একক, যৌগিক একক, এসআই পদ্ধতি, মেট্রিক টন ও ক্রুইন্টাল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- দৈনন্দিন জীবনে থায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।
- একটি জানা আদর্শ অংশের পরিমাণকে পরিমাপের একক হিসেবে ধরা হয়।
- মৌলিক একক সাতটি।
- একাধিক মৌলিক এককের সমষ্টিয়ে তৈরি হয় যৌগিক একক।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

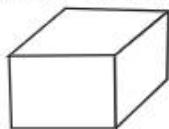
১. ভরের একক কোনটি?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. কিলোমিটার | খ. কিলোগ্রাম |
| গ. কেলভিন | ঘ. ক্যান্ডেলা |

২. যৌগিক একক কোনটি?

- | | |
|---------------|------------------|
| (ক) বর্গমিটার | (খ) অ্যাম্পিয়ার |
| (গ) কেজি | (ঘ) ক্যান্ডেলা |

নিচের উদ্ধীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



A



B

১৫ ঘন সেমি
১০ ঘন সেমি

পাথর ফেলার পরে উচ্চতা
পাথর ফেলার আগে উচ্চতা

৩. B চিত্রের পাথরের আয়তন কত?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. ৫ ঘন সে মি | খ. ১০ ঘন সে মি |
| গ. ১৫ ঘন সে মি | ঘ. ২০ ঘন সে মি |

৮. A চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুটির আয়তন নির্ণয়ের ফের্টে-

- i. তিনটি এককের গুণফল প্রয়োজন
- ii. দুইটি এককের গুণফল প্রয়োজন
- iii. ক্ষেত্রফল ও উচ্চতার গুণফল প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ফারহানের পড়ার ঘরের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গমিটার, যার দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। তার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ সেমি। ফারহানের মা সমাকৃতির আরেকটি টেবিল সেই ঘরে রাখলেন।

ক. এস আই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক কী?

খ. পরিমাপের প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. ফারহানের পড়ার ঘরের প্রস্থ নির্ণয় করো।

ঘ. ফারহানের পড়ার ঘরে ফাঁকা জায়গা থাকার সম্ভাব্যতা যাচাই করো।

২. হোসেন সরকার একজন রঞ্জনিকারক। এ বছর তিনি বিদেশে ৫ মেট্রিক টন পাট রঞ্জনি করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ফের্টে পূর্বে F. P. S. পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বর্তমানে M. K. S পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

(ক) ক্যান্ডেলা কী?

(খ) আয়তনের একক কোন ধরনের একক? ব্যাখ্যা করো।

(গ) হোসেন সরকার এ বছর কত কিলোগ্রাম পাট রঞ্জনি করেন, তা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

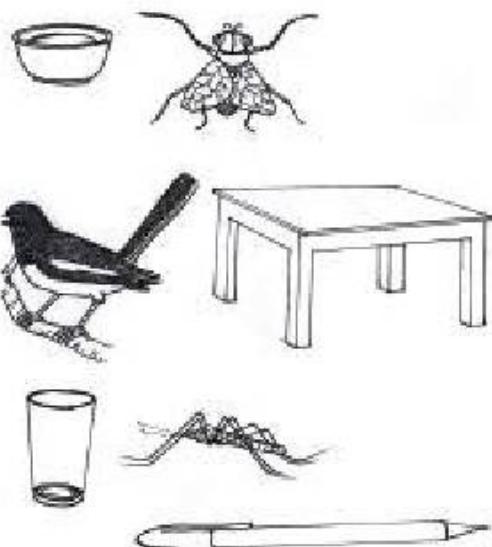
২. ক্ষেত্রফলের একক কোন ধরনের একক? ব্যাখ্যা করো।

৩. এককের গুণিতক প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবজগৎ

ভৌগণ বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী। আমরা আমাদের আশেপাশে একটু তাকালেই এই বৈচিত্র্যের দারুণ সব উদাহরণ দেখতে পাই। এসব বস্তুর মধ্যে কারো জীবন আছে, আবার কারো জীবন নেই। চেরার, টেবিল, গাছপালা, দালান, গাঢ়ি, গ্লাস, কলম এসব হচ্ছে জড়বস্তুর নমুনা। আবার মানুষ, গরু, গাছ, মাছ, মশা, পিংপড়া এসব হচ্ছে জীবের উদাহরণ। আবার এমন কিছু জীবও রয়েছে যাদের খালি ঢোকে দেখা যায় না। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা ইত্যাদি। ছোটো থেকে বড়ো, মাটি থেকে পানি, বাতাসে উপস্থিত নানা প্রকারের জীব নিয়েই আমাদের এই জীবজগৎ গঠিত হয়েছে। সেসব নিয়েই এই অধ্যায়ের আলোচনা।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- জীবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবজগতের শ্রেণিকরণ করতে পারব।
- সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চারপাশের জীবজগৎ সম্পর্কে সচেতন হব এবং মানবজীবনে এসব জীবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।
- বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশে অবস্থিত জীবের শ্রেণিবিন্যাস করে পোস্টারে প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ-১ : জীব কী?

যার জীবন আছে তাকে জীব বলে। যেমন: গাছপালা, গরু, মাছ, পোকামাকড়, বাঁকের ছাতা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। কিন্তু এবার যদি প্রশ্ন করা হয়, জীবন কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। জীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে জীবের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হয়। আর যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদেরকেই জীব হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি জীব যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তা আলোচনা করা হলো।



চিত্র ২.১ : কতিপয় জীব ও জড়

পাঠ-২ : জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। **পৃষ্ঠি লাভ:** জীব টিকে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য থেকে এরা পৃষ্ঠি লাভ করে। কোনো কোনো জীব নিজেই নিজের খাদ্য তৈরি করে। এরা স্বভাবজী। আবার পরভোজী জীব অন্য জীব ভক্ষণ করে পৃষ্ঠি লাভ করে।

২। **বৃদ্ধি ও বিকাশ:** জীবের বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি জীব কোষ নামক গঠনিক একক দিয়ে গঠিত। সময়ের সাথে জৈবিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবের বৃদ্ধি ঘটে ও পরিপূর্ণ জীব হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

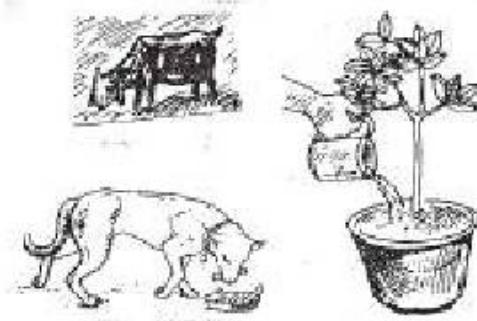
৩। **শক্তির বৃপ্তান্ত:** জীব তার দেহে উৎপন্ন শক্তির বৃপ্তান্ত ঘটায়। যেমন: প্রাণিদেহে উৎপন্ন শক্তি তার দেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।

৪। **প্রজনন:** জীবের প্রজনন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের বংশবিস্তার হয়। মানুষ সন্তান সন্ততি উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটায়।

৫। **পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া:** জীব বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। আমাদের দেহে মশা বসলে আমরা তা মারার জন্য উদ্বৃত্তি হই। অন্ধকার পরিবেশে জন্মানো গাছ আলো পাওয়ার জন্য আলোর দিকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৬। **অভিযোজন:** প্রতিটি জীবের অভিযোজন ক্ষমতা আছে। পরিবেশের পরিবর্তনে টিকে থাকার জন্য জীব হাজার বছরের ব্যবধানে অভিযোজন ক্ষমতা লাভ করে। যেমন, মরুভূমিতে জন্মানো অধিকাংশ গাছের কান্ড রসালো ও পাতাসমূহ কাটায় রুপান্তরিত হয়। এ রুপান্তর গাছকে পানি সাশ্রয়ে সাহায্য করে। দীর্ঘ অভিযোজনের ফলে উদ্ভিদে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংযোজিত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্যগুলো সকল জীবে দেখা যায়। পক্ষান্তরে জড় বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় না।



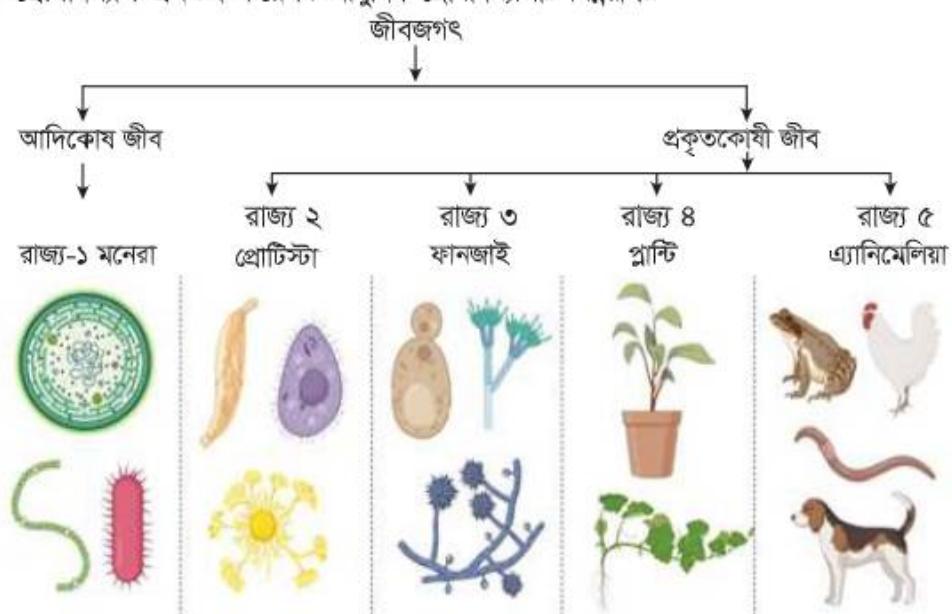
চিত্র ২.২: জীবের খাদ্য ধৰণ

কাজ: দলগত কাজ

তোমার পরিবেশ থেকে একটি উদ্ভিদ সংগ্ৰহ করো। এর মধ্যে জীবের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তা পোস্টার কাগজে লেখ এবং বোর্ডে প্রদর্শন করো।

পাঠ-৩ : জীবের শ্রেণিবিন্যাস

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রায় ৮৭ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের জীব রয়েছে। বৈচিত্র্যময় এই জীবকুলকে সহজভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর সমস্ত জীবকে তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হুইটেকার পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী মার্গুলিস (Margulis) উন্নত শ্রেণিবিন্যাসকে পুনর্বিন্যাস করে জীবজগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসটি নিম্নরূপ:



চিত্র: জীবের শ্রেণিবিন্যাস

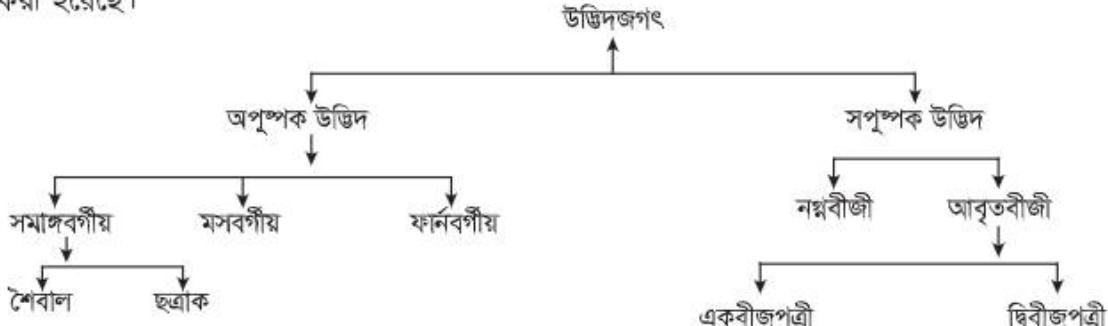
রাজ্য-১: মনেরা : এ রাজ্যের অধীনে বিন্যস্ত জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ক) জীবটি এককোষী এবং এর কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না খ) এরা খুবই ক্ষুদ্র এবং অগুরীক্ষণ যত্ন ছাড়া এদের দেখা যায় না। উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি।

রাজ্য-২: প্রোটিস্টা: এর অধীনে ঐ সকল জীবকে বিন্যস্ত করা হয়, যাদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত এরা এককোষী বা বহুকোষী, ক্লোরোফিল যুক্ত, একক বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে। উদাহরণ: ইউগ্নেনা, অ্যামিবা ইত্যাদি।

রাজ্য-৩: ফানজাই বা ছাতাক : এদের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এরা সাধারণত এককোষী বা বহুকোষী হয়। দেহে ক্লোরোফিল নেই, তাই এরা পরভোজী। উদাহরণ- ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মাশরুম ইত্যাদি।

রাজ্য- ৪: প্লাস্টি (উক্তিদজগৎ) : অধিকাংশ উক্তিদ নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এদের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। এদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও কোষ গহ্বর বিদ্যমান। উক্তিদে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল থাকে, তাই এরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। উদাহরণ: আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

সুবিশাল উক্তিদজগৎকে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আবার নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়।
জর্জ বেনথাম ও ডাল্টন হুকার এর প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উক্তিদ জগৎকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে।



অপুষ্পক উক্তিদ

যেসব উক্তিদে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না তাদেরকে অপুষ্পক উক্তিদ বলে। যেমন: মস, ফার্গ ইত্যাদি। এরা স্পোর বা রেনুর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। অপুষ্পক উক্তিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সমাজবর্গীয় উক্তিদ: এসব উক্তিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। এদের মধ্যে যাদের ক্লোরোফিল আছে, ফলে তারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। যেমন: স্পাইরোগাইরা। আর যাদের দেহে ক্লোরোফিল নেই, ফলে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, তারা ছাতাক। যেমন: এগারিকাস।



স্পাইরোগাইরা



এগারিকাস

চিত্র ২-৩ : সমাজবর্গীয় উক্তিদ

মসবর্গীয় উত্তিদ: এদের দেহ কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এদের মূল নেই, মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড নামক সূত্রাকার তাঙ্গ থাকে। সাধারণত এরা পুরানো ভেজা দেরালে কার্পেটের মতো নরম আস্তরণ করে জন্মায়। যেমন: ব্রায়াম।

ফার্নবর্গীয় উত্তিদ: ফার্নবর্গীয় উত্তিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। এদের দেহে পরিবহণ টিস্যু রয়েছে ও কচি পাতাগুলো কুণ্ডলীত থাকে। বাড়ির পাশে স্যাতস্যাতে ছায়াযুক্ত স্থানে এবং পুরোনো দালানের প্রাচীরে এদের জন্মাতে দেখা যায়। যেমন: টেরিস।

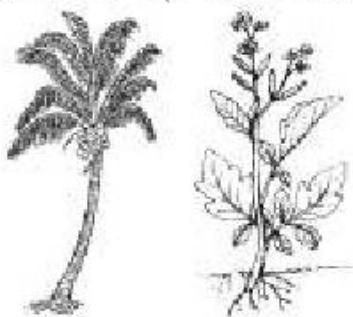


চিত্র-২.৪ : মস ও ফার্ন

কাজ: চেঁকিশাক, লালশাক, লাউশাক, গম, সরিয়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনো এবং কোনটি ফার্ন নয় তা খাতায় লেখো।

সপুষ্পক উত্তিদ

যেসব উত্তিদে ফুল উৎপন্ন হয় তাদেরকে সপুষ্পক উত্তিদ বলে। যেমন: আম, কাঁঠাল, ধান, নারিকেল ইত্যাদি। এদের দেহ সৃষ্টিভাবে মূল, কাণ্ড এবং পাতা বিভক্ত। ফুলের মাধ্যমে পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় এদের বংশবিস্তার ঘটে। বীজের আবরণের উপর নির্ভর করে সপুষ্পক উত্তিদেকে আবার নম্ফবীজী এবং আবৃতবীজী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নম্ফবীজী উত্তিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফল উৎপন্ন হয় না। তাই বীজ নম্ফ অবস্থায় থাকে। উদাহরণ: সাইকাস, পাইনাস ইত্যাদি। আর আবৃতবীজী উত্তিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকায় ফল উৎপাদন হয় এবং বীজ আবৃত থাকে। উদাহরণ: আম, জাম, সুপারি ইত্যাদি।



চিত্র ২-৫: আবৃতবীজী উত্তিদ



চিত্র ২-৬ : নম্ফবীজী উত্তিদ



রাজ্য-৫: অ্যানিমেলিয়া (প্রাণিজগৎ)। এসব জীবের কোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর থাকে না। সাধারণত এ কোষগুলোতে প্লাস্টিডও থাকে না। তাই খাদ্যের জন্য এরা উত্তিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ- মাছ, পাখি, গরু, মানুষ ইত্যাদি।

প্রাণীজগৎকে আবার নানাভাবে ভাগ করা যায়।

মেরুদণ্ডের উপর্যুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রাণীজগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী। মাছ, ব্যাঙ, পাখি, টিকটিকি, গরু, ছাগল, মানুষ ইত্যাদির মেরুদণ্ড আছে। মেরুদণ্ড আছে বলে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণী। মশা, মাছি, প্রজাপতি, চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচো এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অর্থাৎ এদের মেরুদণ্ড নেই।

কাজ: শ্রেণির ৪/৫ জন করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের চারদিকের দেখা প্রাণীগুলোর নাম খাতায় লিখে আনবে। অতঃপর প্রতিটি দল তাদের দেখা প্রাণীগুলোকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে শ্রেণিকরণ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এক দল উপস্থাপনের সময় অন্যরা প্রশ্ন থাকলে তা করবে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী:

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, এদের দেহের ভিতর কঙ্কাল থাকে না, চোখ যৌগিক প্রকৃতির বা একটি চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যা পুঁজাক্ষি। এদের লেজ নেই।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নানা ধরনের হয়। কেঁচো, জোঁক একদলভূক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী এদের, দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত থাকে। শামুক ও বিনুক আরেক দলভূক্ত প্রাণী, এদের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয় এবং দেহ সাধারণত শস্ত খোলসে আবৃত থাকে। মাংসল পা থাকে। প্রজাপতি, মশা, মাছি, তেলাপোকা, উইপোকা, মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গ দলভূক্ত প্রাণী। পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণিভূক্ত প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।



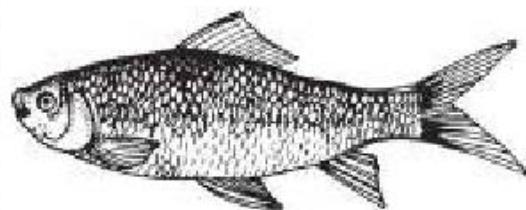
চিত্র ২.৭ : অমেরুদণ্ডী প্রাণী

এদের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত যথা : মন্তক, বক্ষ ও উদর। এদের সন্ধিযুক্ত পা ও পুঞ্জাঙ্কি থাকে। অনেক পতঙ্গ আমাদের উপকার করে। এরা উপকারী পতঙ্গ। যেমন : মৌমাছি, রেশম গোকা ইত্যাদি। মশা ও মাছি নানা রকম রোগ ছড়ায়। অনেক পতঙ্গ আবার আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলের ক্ষতিসাধন করে যেমন : উইপোকা, লেদাপোকা, পামরীগোকা ইত্যাদি। এমন কত গুলো সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাদের তুকে কঁটার মতো অংশ থাকে। তারামাছ ও সামুদ্রিক শশা এই দলভুক্ত প্রাণী। জেলিফিশ প্রবালকীট আরেক দলভুক্ত অমেরংদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহের ভিতর একটা ফাঁপা গহ্বর বা সিলেন্টেরন থাকে। এদের দেহে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে এরা খাদ্য গ্রহণ করে আবার বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণী:

এদের মেরুদণ্ড আছে। দেহের ভিতর কক্ষাল থাকে। পাখনা বা পা থাকে। চোখ সরল প্রকৃতির। মানুষ ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর লেজ থাকে। এরা ফুলকা বা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

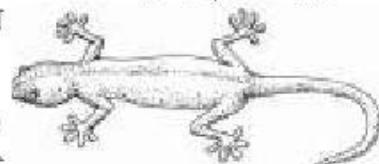
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সকল মাছ মৎস্য শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা পানিতে বাস করে। বেশির ভাগ মাছের গায়ে আঁশ থাকে। যেমন- ইলিশ, রুই, কৈ ইত্যাদি। আবার কতকগুলোর আঁশ থাকে না। যেমন- মাওর, শিং, টেংরা, বোয়াল ইত্যাদি। মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের পাখনা আছে, পাখনার সাহায্যে এরা সাঁতার কাটে।



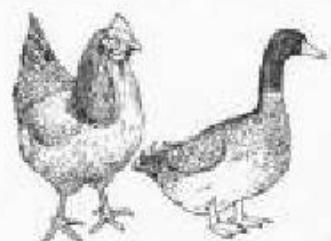
চিত্র ২.৮ : রুই মাছ



চিত্র ২.৯ : ব্যাঙ



চিত্র ২.১০ : টিকটিকি



চিত্র ২.১১ : হাঁস ও মুরগি

ব্যাঙ উভচর শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের জীবনের কিছু সময় ডাঙায় ও কিছু সময় পানিতে বাস করে। এদের তুকে লোম, আঁশ বা পালক কিছুই থাকে না। দুই জোড়া পা থাকে, পায়ের আঙুলে কোনো নখ থাকে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় এরা ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

টিকটিকি, কুমির, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী।

এরা বুকে ভর দিয়ে চলে, আঙুলে নখ থাকে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

হাঁস, মুরগি, করুতর, দোয়েল ইত্যাদি পাখি পক্ষী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী।

এদের দেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে। পালক পাখি চেনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পালক নেই।

বেশিরভাগ পাখিই উড়তে পারে। উট পাখি, পেঙ্গুইন এবং আরও কিছু পাখি আছে যারা উড়তে পারে না। পাখি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়।

বানর, ইদুর, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী শ্রেণিভূক্ত প্রাণী। মানুষও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের দেহে লোম থাকে, বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়, মায়েরা বাচ্চা প্রসব করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি ইত্যাদি থেকে বৃদ্ধিমান। এদের মস্তিষ্ক ও দেহের গঠন বেশ উন্নত।

নিচের ছকটি তোমার বিজ্ঞান খাতায় এঁকে নিয়ে পূরণ করো। প্রতিটি প্রাণীর নিচে তিনটি বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দাও।
যেমন : কুই মাছে আঁশ আছে। তাই কুই মাছের কলামে আঁশের জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দাও।



চিত্র ২.১৩ : মানুষ ও ইদুর

	কাক	বুই মাছ	টিকটিকি	সোনা ব্যাঙ	ইলিশ মাছ	কুকুর	মুরগি	সাপ	ছাগল	কুনো ব্যাঙ
দেহ আবরক										
লোম আছে										
পালক আছে										
আঁশ আছে										
কিছুই নেই										
উপাঙ্গসমূহ										
ভানা আছে										
পা আছে										
কিছুই নেই										
মুখ-গহৰ										
সহজে দাঁত দেখা										
যায়										
দাঁত ছোটো										
দাঁত নেই										

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীব নড়াচড়া করে, পুষ্টি, অজনন, শ্঵সন, অনুভূতি, অভিযোজন, বৃদ্ধি ও রেচন হয়।
- জীবজগতের পাঁচটি রাজ্য, যথা- মনেরা, প্রোটিস্টা, ফানজাই বা ছত্রাক, উদ্বিদ ও প্রাণী।
- অপুষ্পক উদ্বিদ যেমন- সমাঙ্গ উদ্বিদ, মস ও ফার্ন।
- সপুষ্পক উদ্বিদ যেমন- নগুবীজী ও আবৃতবীজী।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউগ্রেনা কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. মনেরা | খ. প্রোটিস্টা |
| গ. প্র্যান্টি | ঘ. ফানজাই |

২. পরভোজী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো এরা-

- i. সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে
- ii. অন্য জীব থেকে খাদ্য গ্রহণ করে
- iii. মৃত জীবের দেহাবশেষ গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জায়ান গ্রামে গিয়ে দেখল তার চাচা সন্ধিযুক্ত পা ও পুঁজাক্ষি বিশিষ্ট এক ধরনের প্রাণী খুব যত্নের সাথে পালন করছে যা উড়ে বেড়াও ও ডিম পাড়ে। একটি গাছের ডালে সে অন্য একটি প্রাণী দেখল যা উড়ে বেড়ালেও ডিম পাড়ে না এবং মাত্র দুক্ষ পান করে।

৩. জায়ানের চাচা কোনটি পালন করে?

- | | |
|---------------|-----------|
| ক. পামরি পোকা | খ. উইপোকা |
| গ. প্রজাপতি | ঘ. মৌমাছি |

৪. জায়ানের দেখা গাছের ডালের প্রাণীটি-

- i. আঙুলে নখযুক্ত
- ii. গায়ে লেমযুক্ত
- iii. বাচ্চা প্রসব করে

নিচের কোনটি সঠিক?

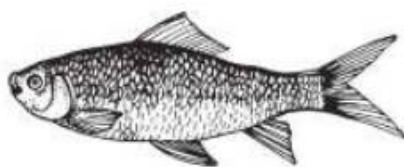
- | | |
|------------|---------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

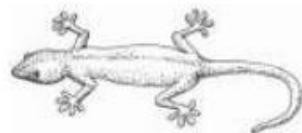
১. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র- A



চিত্র- B



চিত্র- C

ক. মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

খ. শামুক কোন ধরনের প্রাণী? ব্যাখ্যা করো।

গ. C কোন শ্রেণিভূক্ত প্রাণী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'A ও B মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে এরা ভিন্ন'- তুলনামূল বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র- a



চিত্র- b



চিত্র- c

ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে?

খ. মাঝরামকে কোন রাজ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

গ. C কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. a ও b উভয়ই সমান উন্নত কিনা-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। কোন উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না? ব্যাখ্যা করো।

২। সুগারি একটি আবৃতবীজী উদ্ভিদ ব্যাখ্যা করো।

৩। অ্যমিবা কোন রাজ্যের জীব? ব্যাখ্যা করো।

৪। মস উদ্ভিদে কোন অঙ্গটি মূলের কাজ করে? ব্যাখ্যা করো।

৫। জীব কীভাবে পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে? ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান সকল জীব থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অণুজীব সকলেই কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ জীবদেহের গাঠনিক একক এবং কোষের অভ্যন্তরেই জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা জীবের কোষ নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করার চেষ্টা করব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- কোষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের পার্থক্যকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহে কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

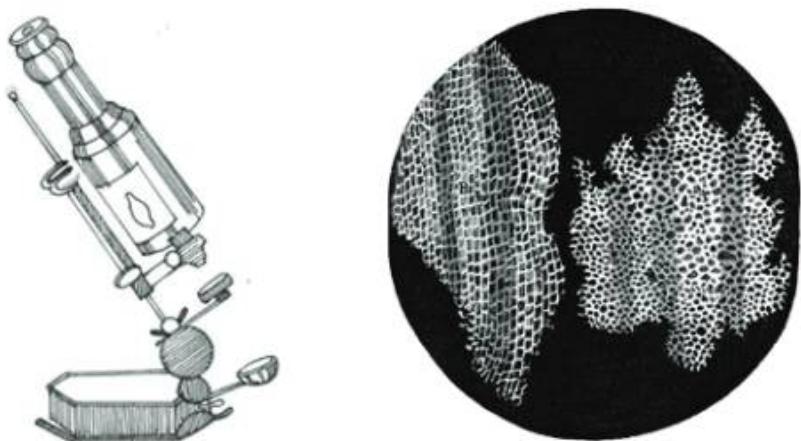
পাঠ-১ : কোষ

জীবদেহের গঠন ও কাজের একক কোষ। পৃথিবীতে অনেক জীব আছে যারা একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি। আবার অনেক জীব বহুসংখ্যক কোষ দিয়ে গঠিত। যেমন: মানুষ, গাছ, পাখি দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে জীবদেহ গঠন করে। এটি অনেকটা ইট দিয়ে তৈরি করা ভবনের মতো।

তোমার বিদ্যালয় ভবনটির কথা ভাবো। একতলা হোক বা পাঁচতলা, এই ভবনটি কিন্তু তৈরি হয়েছে একের পর এক ইট গেঁথে। তাই ইটগুলোকে আমরা বলতে পারি ভবন তৈরির একক। ঠিক এমনিভাবে আমাদের জানা অজানা যত ছোটো ও বড়ো জীব আছে তাদেরও গঠনের মূলে রয়েছে কিছু গাঠনিক একক। তোমার সম্পূর্ণ শরীর, প্রিয় পোষা প্রাণী কিংবা মাঠের গাছ সবকিছুর গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ওই এককসমূহ।

জীবজগতের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজে কোষগুলো যুক্ত থাকে। কাজের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী জীবে কোষের আকৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। বহুকোষী একটি জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সব ধরনের কোষেরই সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন এবং সময়ের প্রয়োজন হয়।

কোষ আণুবীক্ষণীক বস্তু। অর্থাৎ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া কোষ দেখা যায় না। ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষ প্রত্যক্ষ করেন। ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের ছিপি পরীক্ষা করার সময় তিনি মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য কুঠরি পরপর সাজানো দেখতে পান। তিনি বোতলের ছিপির গঠনকারী এই এককগুলোর নাম দেন কোষ।



চিত্ৰ ৩.১ রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং রবার্ট হুকের দেখা বোতলে ছিপির কোষ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র এমন এক প্রকার যন্ত্র যা দিয়ে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে বড়ো আকারে দেখা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিক্ষৃত হয় ঘোড়শ শতাব্দীতে। পরবর্তীতে এন্টনি ফন লিউয়েন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর আরও অনেকের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান সময়ের যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলো আবিক্ষৃত হয়েছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বহুকোষী উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কোষ পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

বৃহদাকার জীবদেহেও ছোটো আকারের অসংখ্য কোষ থাকে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যদি বিভিন্ন কোষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে যে বিভিন্ন কোষের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। কিছু কোষ লম্বাকৃতির, কিছু দেখতে গোলাকার কিংবা দণ্ডাকার, সহ বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। কিছু কোষ আছে যার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অর্থাৎ এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।



চিত্র ৩.২: একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজ : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং বিভিন্ন অংশের নাম লেখো।

পাঠ ২ : জীবকোষের প্রকারভেদ

নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে কোষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আদি কোষ ও অকৃত কোষ। আদি কোষের নিউক্লিয়াস কোনো আবরণী দ্বারা আবদ্ধ নয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া। অকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে আবরণ থাকে। অকৃত কোষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা- দেহকোষ ও জননকোষ। দেহকোষ দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। এসব কোষ বিভাজনের কারণে জীবদেহ বৃদ্ধি পায়। জননকোষের কাজ হলো জীবের প্রজননে অংশ নেওয়া। জীবের দেহে বিভিন্ন আকার আকৃতির কোষ দেখা যায়, যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তাকার ইত্যাদি। সাধারণত কোষ এতই স্ফুর্দ্ধ যে খালি ঢোকে দেখা যায় না।
নতুন শব্দ : প্রোটোপ্লাজম, দেহকোষ, জননকোষ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।



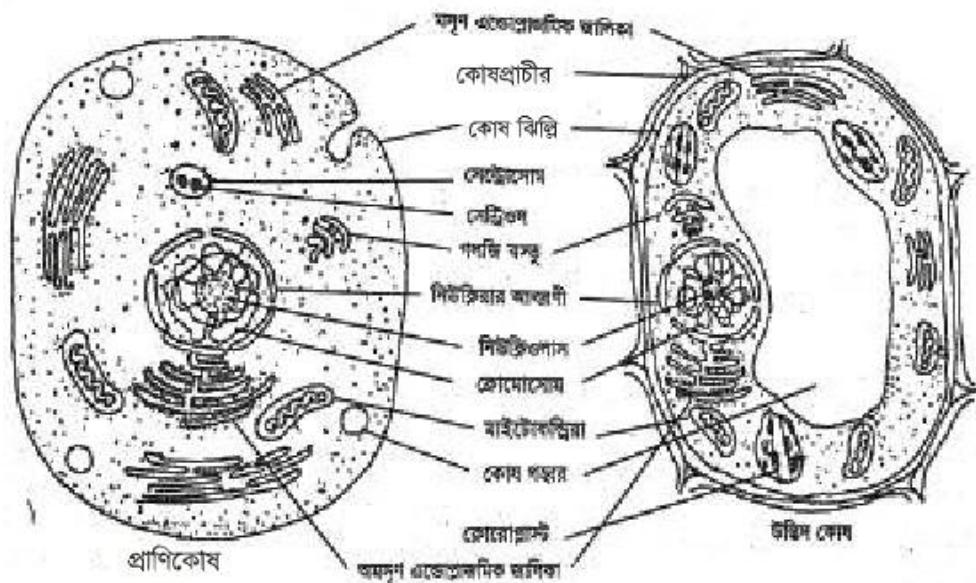
চিত্র ৩.৩: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি ব্যাকটেরিয়া কোষ

পাঠ ৩ - ৬ : একটি জীবকোষের গঠন

একটি জীবকোষ এতই ছোট যে তা খালি ঢোকে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষ কিন্তু বসে নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষ বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের সূক্ষ্ম অংশগুলোও ভালো দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কোষে অনেকগুলো অঙ্গাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এবার কোষের প্রধান প্রধান অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক) কোষপ্রাচীর : শুধু উত্তিদ কোষে কোষপ্রাচীর দেখা যায়। প্রাচীর কোষে কোনো কোষপ্রাচীর নেই। এটি জড় পদার্থের তৈরি। কোনো কোনো কোষের প্রাচীরে ছিদ্র থাকে। এদের কৃপ বলে। কোষপ্রাচীর কোষের আকার প্রদান করে এবং ভেতর ও বাইরের মধ্যে তরল পদার্থ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এরা ভিতরের অংশকে রক্ষা করে।

খ) প্রোটোপ্লাজম: কোষপ্রাচীরের অভ্যন্তরে পাতলা পর্দাবেষ্টিত জেলীর ন্যায় আধা তরল বস্তুটিকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একে জীবনের ভিত্তি বলা হয়। এর তিনটি অংশ, যথা- কোষবিহু, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।



চিত্র ৩.৪: অগুবীক্ষণ বন্ধে দেখা প্রাণী ও উত্তিদ কোষ

১। **কোষঘিলি:** সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে নরম পর্দা দেখা যায় তাকে কোষঘিলি বা সেল মেম্ব্রেন বলে। এটি কোষের ভেতর ও বাইরের মধ্যে পানি, খনিজ পদার্থ ও গ্যাস এর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **সাইটোপ্লাজম:** প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে অর্ধতরল অংশটি থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজম বলে। এর প্রধান কাজ কোষের স্ফুল স্ফুল অঙ্গগুলোকে ধারণ করা। কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজ এখানে সম্পন্ন হয়, যেমন- সালোকসংশ্লেষণ। সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়, এমন কয়েকটি অঙ্গগুরু পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) **প্লাস্টিড:** এগুলোকে বর্ণালাও বলে। সাধারণত প্রাণী কোষে প্লাস্টিড থাকে না। প্লাস্টিড উত্তিদ কোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাতা, ফুল বা ফলের যে বিচির রং আমরা দেখি তা সবই এই প্লাস্টিডের কারণে। সবুজ প্লাস্টিড প্রধানত খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যান্য রঙের প্লাস্টিডগুলো উত্তিদের বিভিন্ন অঙ্গকে রঙিন করে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্ণহীন প্লাস্টিড খাদ্য সঞ্চয় করে।

কাজ : মাটি দিয়ে কোষের একটি মডেল বানাও, যাতে কোষঘাসীর, কোষঘিলি, প্লাস্টিড ও নিউক্লিয়াস থাকবে।

খ) **কোষগহৰ:** পিয়াজের কোষ পরীক্ষা করে দেখো। দেখবে যে কোষের মধ্যে বৃহৎ একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এটাকে কোষগহৰ বলে। নতুন কোষের গহৰ স্ফুল বা অনুপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু একটি পরিণত উত্তিদ কোষে এ গহৰটি বেশ বড়। উত্তিদ কোষে অবশ্যই গহৰ থাকবে। একটি প্রাণী কোষে সাধারণত কোষগহৰ থাকে না, তবে যদি থাকে তাহলে সেটি হবে ছোটো। কোষগহৰে যে রস থাকে, তাকে কোষরস বলে। কোষগহৰ উত্তিদ কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

কোষগহৰ কোষরসের আধার হিসেবে কাজ করে। ইহা ছাড়া কোষের উপর কোন চাপ এলে তাও নিয়ন্ত্রণ করে।

গ) মাইটোকন্ড্রিয়া : একে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বলা হয়। কারণ এই অঙ্গগুর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের প্রায় সকল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এরা দণ্ডকার, বৃত্তাকার বা তারকাকার হতে পারে। এরা দুই স্তর বিশিষ্ট বিল্লি দিয়ে আবৃত্ত থাকে। বাইরের স্তর মসৃণ কিন্তু ভিতরের স্তরটি ভাঁজযুক্ত। মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে শক্তি উৎপাদন করা। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তির আধার বলে।

পাঠ ৭-৮ : নিউক্লিয়াস

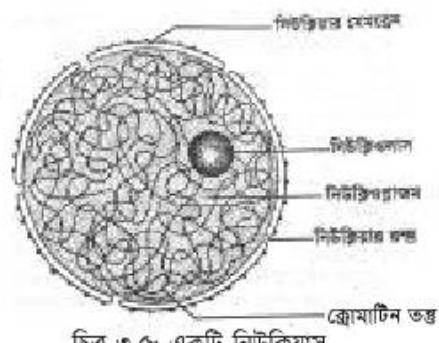
গ্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান গোলাকার ঘন বস্তুটি নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কোষের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নবীন কোষে এদের অবস্থান কোষের কেন্দ্রে। পরিণত কোষে এদের স্থান পরিবর্তন হতে পারে। এরা গোলাকার তবে কখনও কখনও উপবৃত্তাকার বা নলাকার হতে পারে। কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না।

একটি নিউক্লিয়াস প্রধানত (১) নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন (২) নিউক্লিওপ্লাজম (৩) নিউক্লিওলাস (৪) ক্রোমাটিন তন্ত্র ও নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন : এটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে। এই আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলোকে আলাদা করে রাখে। একই সাথে এটি তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিওপ্লাজম : নিউক্লিয়াসের ভিতরের তরল ও স্থচ্ছ পদার্থটিই নিউক্লিওপ্লাজম। এর মধ্যে ক্রোমাটিন তন্ত্র ও নিউক্লিওলাস থাকে।

নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিন্দুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র যে অঙ্গগুটি ক্রোমাটিন তন্ত্র সাথে লেগে থাকে, সেটিই নিউক্লিওলাস।



চিত্র ৩.৫: একটি নিউক্লিয়াস

কাজ : মাটি দিয়ে নিউক্লিয়াসের একটি মডেল বানাও যাতে ক্রোমাটিনতন্ত্র ও নিউক্লিওলাস থাকবে।

ক্রোমাটিন তন্ত্র : নিউক্লিয়াসের ভিতরে সূতার ন্যায় কুণ্ডলী পাকানো বা খোলা অবস্থায় যে অঙ্গগুটি রয়েছে তাই ক্রোমাটিন তন্ত্র বলে। এটি জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যায়। এরা কোষের বৃদ্ধি বা যেকোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চিত্র এঁকে অঙ্গগুর ভিত্তিতে একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন করো।

নতুন শব্দ : ক্রোমাটিন তন্ত্র, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজম।

পাঠ ৯-১০ : জীবদেহে কোষের ভূমিকা

কোষ কী তা তোমরা জেনেছ। কতগুলো কোষ একত্রিত হয়ে যখন একই ধরনের কাজ করে, তখন তাকে কলা বা চিস্যু বলে। আবার বিভিন্ন ধরনের কলা মিলে একটি তন্ত্র বা অঙ্গপ্রতঙ্গ গঠন করে। কোষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিভিন্ন ধরনের কলা গঠন : অনেকগুলো কোষ সম্প্রসারণে একটি কলা ও কলাতত্ত্ব গঠন করে। এফেতে কলায় অবস্থিত সকল কোষ একই ধরনের কাজ করে। পরিবহন, ভারসাম্য রক্ষা করা ও দৃঢ়তা প্রদান করা এদের কাজ।

বিভিন্ন অঙ্গ গঠন : বিভিন্ন ধরনের কোষ ও কলা মিলিত হয়ে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে। যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি। আবার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ষ, ঘৃণ্ণ, পিছা ইত্যাদি প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ।

জীবের দেহ গঠন : ক্ষুদ্র কোষ থেকে জীবের দেহ সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এই কোষ থেকেই জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে। **খাদ্য উৎপাদন :** সবুজ উত্তিদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সবুজ উত্তিদের কোষে ক্লোরোপাস্ট নামক প্লাস্টিড থাকে। এই ক্লোরোপাস্ট সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

শক্তি উৎপাদন : জীবের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্য থেকে জীব শক্তি পায়।

খাদ্য ও পানি সঞ্চয় : কিছু কিছু উত্তিদের কোষ পানি সঞ্চয় করে রাখে। আবার কোনো কোনো কোষ খাদ্য মজুদ করে, যেমন : ফণিমনসা, আলু ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও রস নিঃসরণ : বিশেষ করে প্রাণীতে এক ধরনের কোষ দেখা যায়, যার কাজ হলো প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসরণ করা। যেমন- পিন্টুরস, ইনসুলিন, জারক রস ইত্যাদি।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বা 'সেল' বলে।
- কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।
- কোষ দুই ধরনের, যথা-আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ।
- সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপই প্রোটোপ্লাজম।
- উত্তিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড, কোষগহ্বর ইত্যাদি থাকে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিউক্লিয়াসের কাজ কোনটি?

- ক. কোষের আকার ও আকৃতি ঠিক রাখা
গ. কোষের যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা

- খ. খাদ্য সঞ্চয়ের ভাগার হিসেবে কাজ করা
ঘ. সাইটোপ্লাজম ধারণ করা

২. প্রাণী কোষ থেকে নিঃসৃত হয়-

- i. পিন্টুরস
ii. ইনসুলিন
iii. জারক রস

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

৩। কোনটি উঙ্গিদ কোষে থাকে না?

ক. মাইটোক্লিয়া

খ. প্লাস্টিড

গ. সেন্ট্রোসোম

ঘ. কোষপ্রাচীর

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আয়াজ বাবার সাথে ঢাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যায়। গার্ডেনে সে বিভিন্ন বর্ণের গাছপালা দেখতে পায়। পরবর্তীতে সে পার্শ্ববর্তী চিড়িয়াখানায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন প্রাণী দেখতে পায়।

ক. নিউক্লিয়াস কী?

খ. কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কোনটি? ব্যাখ্যা করো।

গ. আয়াজের পর্যবেক্ষণকৃত প্রথম জীবগুলো বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আয়াজের দেখা দুই ধরনের জীবের কোষীয় বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র A



চিত্র B

ক. কোষ কাকে বলে?

খ. উঙ্গিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি? ব্যাখ্যা করো।

গ. তারকাচিত্র A তে অবস্থিত প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি ব্যবহার করে প্রাণী কোষের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

ঘ. তারকাচিত্র B এ অবস্থিত কোন অংগগুটি কোষের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ করে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। ব্যাকটেরিয়ার কোষের ধরন ব্যাখ্যা করো।

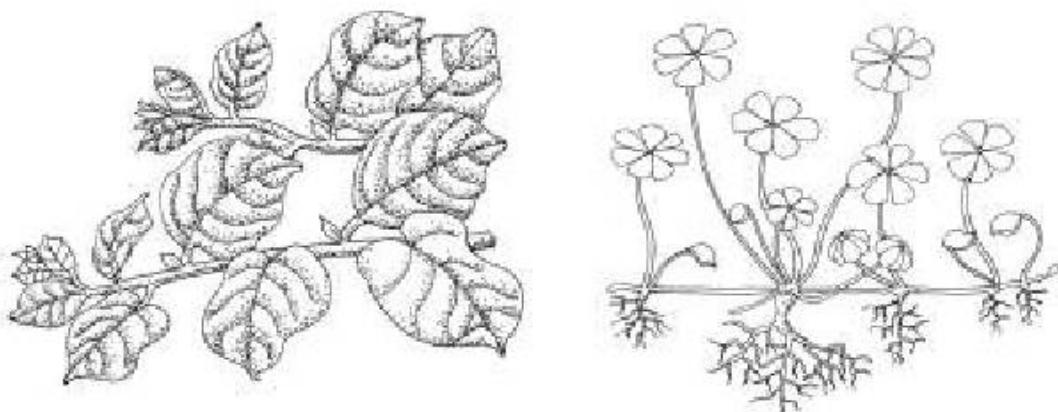
২। কোন অঙ্গগুকে কোষের বর্ণাধার বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

৩। ক্রোমাটিন তন্ত্র কোষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ধিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ইতঃপূর্বে আমরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ধিদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জানি, উন্নত উদ্ধিদ দুই ধরনের যথা নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ধিদ। আবৃতবীজী উদ্ধিদকে একটি আদর্শ উদ্ধিদ হিসেবে ধরে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা আমরা এ অধ্যায়ে জানব। একটি সপুষ্পক উদ্ধিদের কোন কোন অংশ থাকে, কোথায় তাদের অবস্থান তা জানব। এর প্রধান অংশগুলোর প্রকারভেদ, কাজ ও মানবজীবনে এসব অঙ্গের অবদান কী তা আলোচনা করা হবে।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ধিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ধিদ এবং মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ধিদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

পাঠ-১ : আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন

আমরা চারপাশের পরিবেশে অগণিত উদ্ভিদ দেখতে পাই। এসব উদ্ভিদের আকার ও গঠনে অনেক বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহে মূল কাণ্ড ও পাতা থাকে। এদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ। যেমন- আম, জাম, ছোলা, লাউ, ধান, গম ইত্যাদি। ধান, গম, ঘাস একবীজপত্রী ও আম, কাঠাল, সরিষা, মরিচ দ্বিবীজপত্রী সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদকে আদর্শ উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এরা সর্বোচ্চত উদ্ভিদ।

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করা যায়।

বিটপ : উদ্ভিদের যে অংশগুলো মাটির উপরে থাকে তাদের একত্রে বিটপ বলে। বিটপে কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থাকে। কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য ও শীর্ষ মুকুল থাকে। ফুলগুলো পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃত্তি, দল, পুঁকেশের ও গর্ভাশয় থাকে। এ কথাগুলোর সাথে পাশের পরিচিত মরিচ গাছের চিত্র মিলিয়ে দেখি।

১। **কাণ্ড :** প্রধান মূলের সাথে লাগানো মাটির উপরে উদ্ভিদের অংশটি কাণ্ড। কাণ্ডের গায়ে পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে। পর্ব থেকে পাতা উৎপন্ন হয়। কাণ্ড পাতা ও শাখা প্রশাখার ভার বহন করে।

২। **পাতা :** শাখা প্রশাখার গায়ে সৃষ্টি চ্যাপ্টা সবুজ অঙ্গটি পাতা বা পত্র। পাতায় খাদ্য তৈরি হয়।

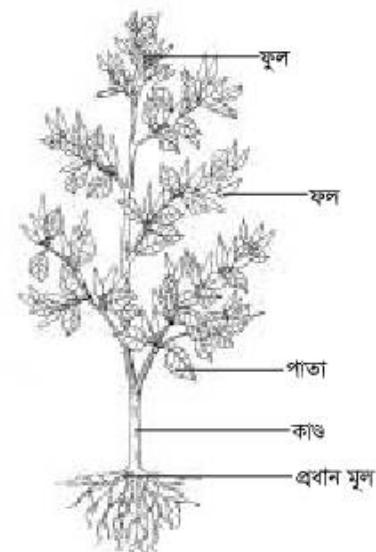
৩। **ফুল :** পত্র কক্ষে সাদা রঙের ছোটো ছোটো ফুল হয়। এই ফুল থেকে ফল অর্থাৎ মরিচ হয়।

৪। **ফল :** ফুল বৃড়ো হয়ে বারে যায়। বারা ফুলের গোড়ায় ফুলের যে অংশটি থেকে যায় তা বড়ো হয়ে ফল সৃষ্টি করে। গর্ভাশয়ই বড়ো হয়ে ফলে পরিণত হয়। মরিচ গাছের ফলই মরিচ।

মূল : উদ্ভিদের পর্ব, পর্বমধ্য ও অগ্রমুকুলবিহীন অংশই মূল। সাধারণত মানুষ মনে করে উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশই মূল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বক্তব্যটি সত্য তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কাণ্ড, পত্র, ফুল, ফল মাটির নিচের জন্যে, যেমন- আদা, হলুদ, পিঁয়াজ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে উপরের শ্রেণিতে তোমরা বিশদ জানতে পারবে।

কাজ : বিদ্যালয়ের পাশে থেকে ছেটি একটি গাছ মূলসহ তুলে আনো। এবার তার চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম লিখো।

সাধারণত মূল ভ্রগমূল হতে উৎপন্ন হয়। মূলে পাতা, ফুল বা ফল হয় না। সাধারণত মূল নিয়মানুসূচী। ভ্রগমূলটি বৃক্ষ পেয়ে প্রধান মূল গঠন করে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল, শাখা মূল থেকে প্রশাখা মূল উৎপন্ন হয়।



চিত্র ৪.১: একটি মরিচ গাছের বাহ্যিক গঠন

পাঠ-২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ

মূলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। এর শেষ প্রান্তে টুপির মতো অংশটি হচ্ছে মূলটুপি বা মূলএ। আগাত থেকে মূলকে রক্ষা করা এর কাজ। এর পেছনের মসৃণ অংশটি বর্ষিষ্ঠ অংশল। এ স্থানে মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এই এলাকার পেছনে সূক্ষ্ম লোমশ মূলরোম অংশল অবস্থিত। মূলরোম দিয়ে উড়িদ পানি শোষণ করে। এই অংশগুরের পর মূলের স্থায়ী এলাকা অবস্থিত। স্থায়ী অংশল থেকে মূলের শাখা ও প্রশাখা সৃষ্টি হয়।

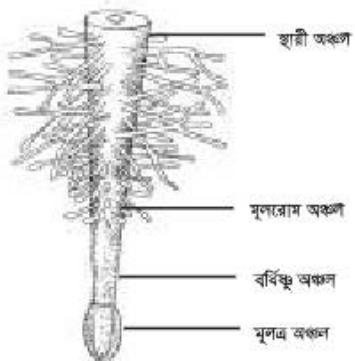
নূতন শব্দ : মূলরোম, মূলটুপি ও মূলত্র।

পাঠ ৩-৪ : মূলের প্রকারভেদ ও কাজ

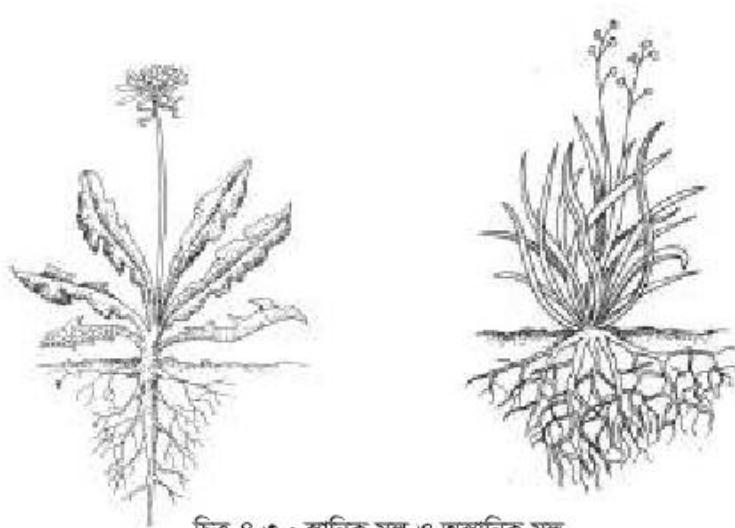
সব গাছের মূল কি একই ধরনের হয়? ধানের মূল আর আম গাছের মূল কি এক ধরনের? বটের বুরিও আসলে এক ধরনের মূল। উড়িদের প্রয়োজনে এ মূলগুলো ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বটের বুরিমূল, কেয়া গাছের ঠেসমূল, পানের আরোহী মূল উড়িদের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের কাজ করে।

আমরা খেয়াল করলে দেখব যে, সকল ধরনের উড়িদের মূল এক রকমের নয়। একটি মরিচ বা একটি আম গাছের মূল অবশ্যই ধান, ভুট্টা বা ঘাস এর মূল হতে ভিন্ন রকমের। এরূপ ভিন্নতার জন্য মূলকে এর উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। স্থানিক মূল ও ২। অস্থানিক মূল।

১। **স্থানিক মূল:** ভূগর্ভস্থ বৃক্ষ পেয়ে প্রধান মূল হিসেবে সরাসরি মাটিতে প্রবেশ করে। প্রধান মূল শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। তখন এদেরকে স্থানিক মূলতন্ত্র বা স্থানিক মূল বলে। যথো আম, জাম কাঁঠাল, লিচু, বেগুন, সরিয়া, ইত্যাদি।



চিত্র ৪.২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ



চিত্র ৪.৩ : স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূল

কাজ : মূলসহ একটি মরিচের চারা ও একটি ধানের চারা সংগ্রহ করো। এদের মূলের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তার তালিকা করো।

২। অস্থানিক মূল : এসব মূল জ্ঞানমূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে কাও ও পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। এরা দুই ধরনের। যথা-
ক) গুচ্ছ মূল ও খ) অগুচ্ছ মূল।

ক) গুচ্ছ মূল : ধান, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি উভিদের মূল লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ডের নিচের দিকে এক গুচ্ছ সরু মূল সৃষ্টি হয়েছে। এরা গুচ্ছমূল। জ্ঞানমূল নষ্ট হয়ে সে স্থান থেকেও গুচ্ছ মূল উৎপন্ন হতে পারে। সাধারণত একবীজপত্রী উভিদে গুচ্ছমূল থাকে। যেমন-ধান, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি।

খ) অগুচ্ছ মূল : এসব মূল একত্রে গাদাগাদি করে গুচ্ছকারে জন্মায় না বরং পরম্পর থেকে আলাদা থাকে। কেয়া গাছের ঠেশমূল, বটের ঝুরিমূল এ ধরনের অগুচ্ছ মূল।

কাজ : মূলসহ একটি ধানের চারা, সরিষার চারা, ঘাস তুলে এনে দেখো এবং নারিকেল গাছের মূলের সাথে তাদের মূলের মিল এবং অমিল উল্লেখ করো।

মূল নিম্নলিখিত কাজসমূহ করে থাকে :

- ১। মূল উভিদেকে মাটির সাথে শক্তভাবে আটকে রাখে ফলে ঝড় বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না।
- ২। মূল মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ করে। আমরা জানি, মূলে মূলরোম অঞ্চল বলে একটি অংশ থাকে। এখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে উভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে।

নতুন শব্দ : অধানমূল, স্থানিকমূল, অস্থানিকমূল, গুচ্ছমূল, শোষণ ও মূলরোম।

পাঠ-৫ : কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

আমরা যখন আম পাঢ়তে গাছে উঠি, তখন মাটির ওপরে গাছের খাড়া লম্বা অংশটি আঁকড়ে ধরে তবেই গাছে উঠি। এটাই গাছের কাও। কুল গাছের যে ভালে বসে কুল খাই এগুলো শাখা। গাছের শাখাও কিন্তু কাণ্ডেরই অংশ। উভিদের যে অংশ থেকে শাখা-প্রশাখা পাতা উৎপন্ন হয়, তাই কাও। এতে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল থাকে।



চিত্র ৪.৪ : একটি শাখা কাণ্ড

- ১। পর্ব : কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্ব বা সঙ্কি বলে।

২। পর্বমধ্য : পাশাপাশি দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশটি পর্বমধ্য। পর্বমধ্য গাছকে খাড়া রাখতে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পর্বমধ্য থেকে কোনো ধরনের মূল, পাতা বা শাখা সৃষ্টি হয় না।

- ৩। মুকুল : কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে প্রকক্ষ বলে।

সাধারণত মুকুল এ পত্রকক্ষে জন্মে। তবে শাখার অঞ্চলাগো মুকুল সৃষ্টি হয়। কাঞ্চিক মুকুল পত্রকক্ষে এবং শীর্ষ মুকুল কাও বা শাখার অঞ্চলাগো জন্মে।

কাজ : একটি বৃক্ষ হতে ছোট একটি শাখা নিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করো। এবার এর চিত্র আঁক এবং অংশগুলি চিহ্নিত করে দেখাও।

নতুন শব্দ : শীর্ষমুকুল, পত্রকক্ষ, পর্ব, পর্বমধ্য ও কাঞ্চিক মুকুল।

পাঠ-৬ : কাণ্ডের শ্রেণিকরণ

একটি আম গাছের কাণ্ড, একটি লাউগাছের কাণ্ড এবং একটি নারকেল গাছের কাণ্ড লক্ষ করি। কোনোটির কাণ্ড বেশ শক্ত, কোনোটি দুর্বল আবার কোনোটির মধ্যে কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এ থেকে ধারণা করা যায় যে কাণ্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে এদের প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা-১) সবল কাণ্ড ও ২) দুর্বল কাণ্ড।

১) সবল কাণ্ড : এসব কাণ্ড শক্ত ও খাড়াভাবে গাছকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। যেমন : আম, জাম, নারিকেল, তাল ইত্যাদি গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলোর কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে আবার কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে না।

ক) অশাখ কাণ্ড : এসব কাণ্ডের কোনো শাখা হয় না। কাণ্ডটি লম্বা হয়ে বেড়ে ওঠে। এর শীর্ষে পাতার মুকুট থাকে। খেয়াল করলে দেখবে নারিকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি গাছের কাণ্ড এ ধরনের হয়।

খ) শাখাস্থিত কাণ্ড :

১. মঠ আকৃতি : কোনো কোনো গাছে প্রধান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণাঙ্গ গাছটিকে একটি মঠের ন্যায় দেখায়। এ গাছের নিচের দিকের শাখাগুলো বড়ো এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের শাখাগুলো ছোটো হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ গাছটি নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মঠের ন্যায় আকার ধারণ করে। দেবদারু, বিলেতি ঝাউ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কাণ্ড দেখা যায়।

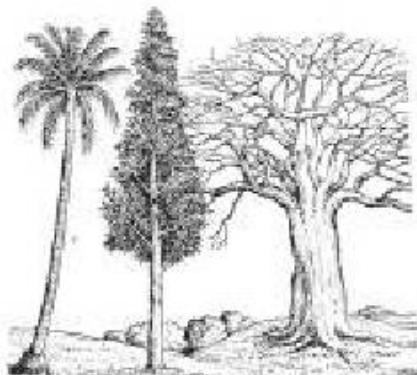
২. গম্বুজ আকৃতি : কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো ও মোটা হয় এবং শাখা ও প্রশাখাগুলো এমনভাবে এই প্রধান কাণ্ডে বিন্যস্ত হয় যে গাছটিকে একটি গম্বুজের ন্যায় দেখায়, যেমন- আম, কঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

৩. তৃণ কাণ্ড : এসব কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট। পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যথা- বাঁশ, আখ ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে এসব কাণ্ডের পর্বগুলো ফাঁপা বা ভরাট হতে পারে।

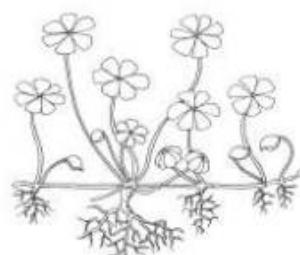
২) দুর্বল কাণ্ড : কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে বা মাচার উপরে বৃদ্ধি পায়। এদের কাণ্ডে সাধারণত কাষ্ঠ থাকে না তাই এরা দুর্বল ও নরম। এদের কোনোটি লতানো, কোনোটি শয়ান আবার কোনোটি আরোহিণী।



চিত্র ৪.৬ : ট্রেইলার বা শয়ান কাণ্ড



চিত্র ৪.৫ : অশাখ, মঠ আকৃতি, গম্বুজ আকৃতির কাণ্ড

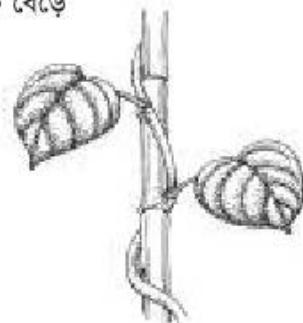


চিত্র ৪.৭ : ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড

ক) ক্রিপার বা লতানো : এসব কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের প্রতিটি পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, যেমন- ঘাস, আমরূল ইত্যাদি।

খ) ট্রেইলার বা শয়ান : এসব কাণ্ড মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না। যথা- পুই, মটরগুঁটি ইত্যাদি।

গ) আরোহিণী : এ সকল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে বেড়ে ওঠে, এরা ক্লাইমার বা আরোহিণী। যথা- শিম, পান, বেত ইত্যাদি।



চিত্র ৪.৮ : আরোহিণী কাণ্ড

কাজ : তোমরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড পর্যবেক্ষণ করো। এবং কোন গাছের কাণ্ড কী ধরনের তা খাতায় নোট করো। শ্রেণিতে ফিরে কাণ্ডের শ্রেণিকরণ করো।

পাঠ-৭ : কাণ্ডের কাজ

গাছের কাণ্ড কী কী কাজ করে অনুমান করে তোমার খাতায় লেখো। এবার নিচের তালিকার সাথে তোমার তালিকা মিলিয়ে দেখো।

- ১। কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল এবং শাখা-প্রশাখার ভার বহন করে।
- ২। কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে যাতে সূর্যের আলো যথাযথভাবে পায়।
- ৩। কাণ্ড শোষিত পানি ও খনিজ লবণ শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুলে এবং ফলে পরিবহন করে।
- ৪। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
- ৫। কচি অবস্থায় সবুজ কাণ্ড সালোকসংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করে।

পাঠ-৮ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাশের দিকে উৎপন্ন চ্যাপটা অঙ্গটি হলো পাতা। পাতা সাধারণত চ্যাপটা ও সবুজ বর্ণের হয়। নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে পাতা থাকে না। তবে ফার্ন ও মস জাতীয় উদ্ভিদে পাতার ন্যায় অঙ্গ থাকে। মসের পাতা অকৃত পাতা নয়।

আদর্শ পাতায় পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক এ তিনটি অংশ থাকে। যেমন : আম, জবা ইত্যাদি।

পাতার বিভিন্ন অংশ

একটি জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলেই এর তিনটি অংশ দেখা যাবে, যেমন- ১) পত্রমূল, ২) বৃত্ত বা বেঁটা ও ৩) পত্রফলক।

১। **পত্রমূল :** পাতার এই অংশটি কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার গায়ে যুক্ত থাকে। কোনো কোনো উদ্ভিদের পত্রমূলের পাশ থেকে ছোট পত্রসদৃশ অংশ বের হয়। এগুলো উপপত্র। মটর গাছের পত্রমূলে এরূপ উপপত্র দেখা যায়।

২। **বৃত্ত বা বেঁটা :** পাতার দণ্ডকার অংশটি হলো বৃত্ত বা বেঁটা। বৃত্ত বা বেঁটা পত্রমূল ও ফলককে যুক্ত করে। শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃত্ত খুব লম্বা হয়। আবার শিয়াল কাঁটা গাছের পাতায় কোনো বেঁটাই থাকে না।



চিত্র ৪.৯ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

কাজ : বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে যে কোনো একটি গাছের পাতা সংগ্রহ করো, পর্যবেক্ষণ কর ও চিত্র আঁকো।

বৃত্ত বা বেঁটা পত্রফলককে এমনভাবে ধরে রাখে, যাতে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পেতে পারে। এ ছাড়া কাণ্ড আর ফলকের মধ্যে পানি, খনিজ লবণ ও তৈরি খাদ্যের আদান-প্রদান করা এর কাজ।

৩। **পত্রফলক :** পত্র বৃত্তের উপরে চ্যাপ্টা সবুজ অংশটি পত্র ফলক। বৃত্তশীর্ষ হতে যে মোটা শিরাটি ফলকের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সেটি মধ্যশিরা। এই মধ্যশিরা থেকে শিরা-উপশিরা উৎপন্ন হয়। ফলকের কিনারাকে পত্র কিনারা বলে।

পাতার সাধারণ কাজ : একটি পাতার সাধারণ কাজগুলি নিচে দেওয়া হলো :

ক) খাদ্য তৈরি করা পাতার প্রধান কাজ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

খ) গ্যাসের আদান প্রদান করা একটি শুরুত্বপূর্ণ কাজ। শসনকার্য পরিচালনার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। আবার খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বের করে দেয়।

গ) উদ্ভিদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এই অতিরিক্ত পানি পাতার সাহায্যে বাঞ্চাকারে বাইরে বের করে দেয়।

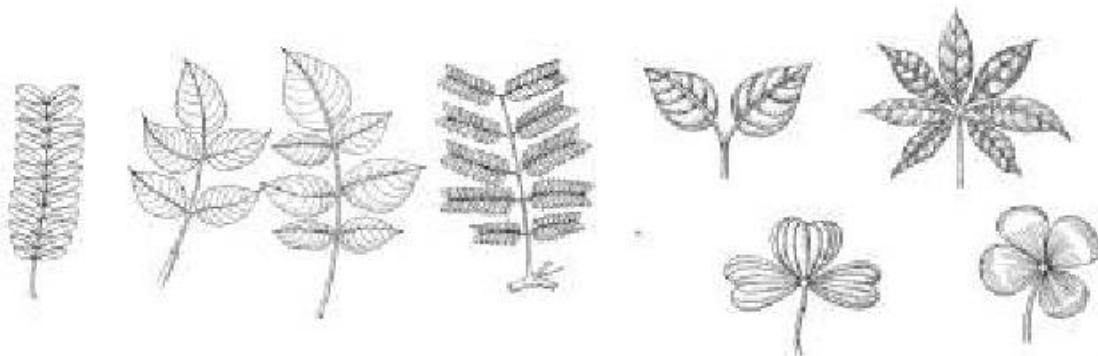
নতুন শব্দ : পত্রমূল, বৃত্ত বা বেঁটা ও পত্রফলক।

পাঠ-৯ : পাতার প্রকারভেদ

একটি আমের পাতা ও একটি তেঁতুলপাতা হাতে নিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে আমপাতার ফলকটি অখণ্ডিত। কিন্তু তেঁতুলপাতাটির ফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খণ্ডিত। পত্রফলকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১) সরলপত্র ও ২) বৌগিকপত্র।

১। **সরলপত্র :** সরলপত্রে বৃত্তের উপরে একটিমাত্র পত্র ফলক থাকে। আম, জাম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা সরলপত্র। একটি সরল পত্রের কিনারা অখণ্ডিত বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে।

২। যৌগিকপত্র : গোলাপ, নিম, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, নারকেল, সজনে ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোটো ছোটো ফলক থাকে। এরা অণুফলক। যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অণুফলক সৃষ্টি করে। অণুফলক বা পত্রকগুলো যে দণ্ডে সাজানো থাকে তাকে র্যাকিস বা অঙ্ক বলে। বিভিন্ন ধরনের যৌগিকপত্র রয়েছে। পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিকপত্র দুই ধরনের, যথা- i) পক্ষল যৌগিকপত্র এবং ii) করতলাকার যৌগিকপত্র।



চিত্র ৪.১০ : বিভিন্ন রকমের পক্ষল যৌগিকপত্র

চিত্র ৪.১১ : বিভিন্ন রকমের করতলাকার যৌগিকপত্র

নতুন শব্দ : সরলপাতা, যৌগিক পাতা ও মধ্যশিরা।

পাঠ- ১০ : মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা

আমরা উদ্ভিদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ, ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। প্রাণী থেকে প্রাণ দ্রব্যাদিও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেরই অবদান।

ক) মূলের ব্যবহার : মূল, গাজর, শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদেয় সবজি। শতমূলী, সর্পগন্ধা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয়।

খ) কাণ্ডের ব্যবহার : বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। গোল আলু, আদা, পুই, ডাটা, কচু বা ওলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি। খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাওয়া রস উপাদেয় পানীয়। বড়ো বড়ো কাণ্ড থেকে আমরা ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পেয়ে থাকি। পাট বা শণের কাণ্ড থেকে প্রাণ আঁশ দিয়ে দড়ি, ছালা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি হয়।

গ) পাতার ব্যবহার : লাউশাক, পুইশাক, লালশাক, পালং, পাটশাক ও কলমিশাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। কলা, তাল ও আনারস গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। এই আঁশ দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। তালপাতা ও গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামাক পাতা থেকে বিড়ি-সিগারেট প্রস্তুত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। খেজুর পাতা দিয়ে সুস্বর পাতি তৈরি হয়। তালপাতার পাথা তোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে। বাসক, নিশিন্দা, কুচি, থানকুনি, গাঁদা ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়।

^২ নতুন শব্দ : মূল, কাণ্ড, মূলত, জন, শিরা, ফলক, বৃন্ত ও যৌগিকপত্র।

পাঠ-১১ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি আচরণ

উদ্ভিদ আমাদের অনেক উপকার করে। এ জন্য উদ্ভিদের বেশি বেশি যত্ন করা দরকার। অকারণে কখনও গাছ কাটবে না বা গাছের ভাল ভাঙবে না। তোমার-আমার বলে কথা নেই, গাছ জাতীয় সম্পদ ও পৃথিবীর জলবায়ু সংরক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। খরা, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থ ঠেকাতেও গাছের যত্ন অতীব প্রয়োজনীয়। এসো আমরা অধিক গাছ লাগাই ও তার যত্ন নিই এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করি। পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া খুবই প্রয়োজন। গৃহপালিত পশুপাখি আমাদের অনেক উপকার করে। বনের পশুপাখিও প্রকৃতির সম্পদ। এদেরও যত্ন নিতে হবে। অনর্থক পশুপাখি ধ্বংস করব না। অতিথি পাখি শিকার করব না। এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা দরকার।

কাজ : গাছের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি র্যালি আয়োজন করো।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- মূল পানি শোষণ করে এবং গাছকে মাটির সাথে বেঁধে রাখে। মূল প্রধানত দুই ধরনের, স্থানিক ও অস্থানিক।
- কাণ্ড শাখা, পাতা ও ফল-ফুলের ভার বহন করে। কাণ্ড প্রধানত দুই ধরনের, সরল কাণ্ড ও দুর্বল কাণ্ড।
- পর্ব থেকে সৃষ্টি পার্শ্বীয় চ্যাপটা ও সবুজ অংশটি পাতা। পাতা দুই ধরনের, সরল ও যৌগিক।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তার নাম কি?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. পর্ব | খ. মুকুল |
| গ. পর্মধ্য | ঘ. পত্রকক্ষ |

২. আখ তৃণ কাণ্ড। কারণ এর-

- i. কাণ্ড খাট ও মোটা
- ii. পর্ব ও পর্মধ্য খুবই স্পষ্ট
- iii. পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

নিচের উদ্দিপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাফিসা খানম তার বাড়ির আঙিনায় প্রথম বছর কুমড়া এবং পরবর্তী বছর পুরুষাক আবাদ করলেন।

৩. নাফিসা খানমের প্রথম বছর আবাদকৃত উদ্ভিদটির কাণ্ডের প্রকৃতি কীরূপ?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. তৃণ | খ. লতানো |
| গ. শয়ানো | ঘ. আরোহিণী |

৪. নাফিসা খানমের দ্বিতীয় বছরে আবাদকৃত উঙ্গিদের কাণ্ডের ফলে বলা যায়-

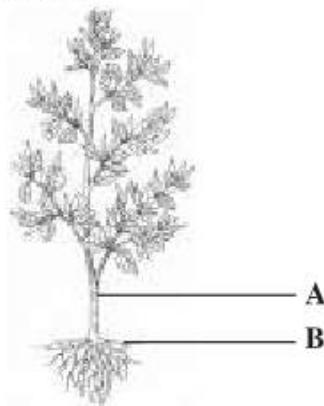
- এটি মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে
- পর্ব থেকে মূল বের হয় না
- অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বৃক্ষ লাভ করে নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



- সম্পূর্ণক উঙ্গিদ কাকে বলে?
- পর্মধ্য কি? ব্যাখ্যা করো।
- A অংশের গঠন ব্যাখ্যা করো।
- A ও B অংশের শুরুত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

২. আতিফ ছুটিতে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। একদিন সে গ্রামে ঘুরতে বেড়িয়ে উঙ্গিদ কাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ করল। এদের মধ্যে কোনটির শাখা-প্রশাখার বিন্যাস মুচ্চ আকৃতির, আবার কোনটির গম্ভুজ আকৃতির। এই কাণ্ডগুলোর আকৃতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে সে কৌতুহলী হয়ে উঠল।

- মূল কাকে বলে?
- আম গাছের পাতার ধরন ব্যাখ্যা করো।
- আতিফের পর্যবেক্ষণকৃত অংশটি উঙ্গিদের কি কাজ ব্যাখ্যা করো।
- তুমি কীভাবে আতিফ এর পর্যবেক্ষণকৃত কাণ্ডের শাখা-প্রশাখার বিন্যাসকে আলাদা করবে? বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ধান গাছের মূল কী ধরনের মূল? ব্যাখ্যা করো।
- কোন অবস্থায় কান্দ সলোকসংশ্লেষণ প্রতিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
- নিম্নের পাতার ধরন ব্যাখ্যা করো।
- মরিচের মূল ধানগাছের মূলের থেকে ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

সালোকসংশ্লেষণ

পৃথিবীর প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এ খাদ্য কোথা থেকে আসে, তা কি তোমরা জান? সাধারণত সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। তবে এর বাইরে সবুজ শৈবাল ও কিছু ব্যাকটেরিয়াও খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। উদ্ভিদ নিজে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করে তার দেহের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে লাগায়। সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে, এ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের উপর জীবজগতের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য প্রস্তুতে উদ্ভিদের অবদান উপলক্ষ করতে পারব এবং উদ্ভিদের প্রতি সংবেদনশীল হব।

পাঠ ১-২ : উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে

কাজ করার জন্য শক্তি লাগে তা সে কাজ কোনো যন্ত্র করুক বা কোনো জীবই করুক। মোটরগাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেলের শক্তি দ্বারা। তোমার শ্রেণিকক্ষের পাখা ঘোরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। আমরা যে হাঁটাচলা করি, নানা ধরনের কাজ করি তার জন্যও তো শক্তি লাগে। সে শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সেই শক্তি পেয়ে থাকি। এখন খাবারের মধ্যে শক্তি এলো কেমন করে। আমরা জানি, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অংশ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

উদ্ভিদের পাতার সবুজ প্লাস্টিড সালোকসংশ্লেষণে অংশ নেয়। এ প্লাস্টিডের ভিতরে সৌরশক্তি, পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে অক্সিজেন ও গুকোজ উৎপন্ন করে।

পাতাকে সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থানরূপে কেন গণ্য করা হয়। কারণ-

১. পাতা চ্যাপ্টা ও সম্প্রসারিত হওয়ায় বেশি পরিমাণ সূর্যরশ্মি এবং অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়।
২. পাতার কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা অনেক বেশি।
৩. পাতায় অসংখ্য পত্ররঞ্চ থাকায় সালোকসংশ্লেষণের সময় গ্যাসীয় পদার্থের আদান প্রদান সহজে ঘটে।

পাঠ ৩-৬ : সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি

স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোম দ্বারা পানি শোষণ করে। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলো একটি অপরিহার্য উপাদান। আলোর প্রধান উৎস সূর্য।

সালোকসংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড পত্রক্রের ভিতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে। এরপর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া ঘটে ও ফুকোজ উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি প্রথক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। পর্যায় দুটি হলো- (১) আলোক পর্যায় ও (২) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়। এ বিষয় পরবর্তী শ্রেণিতে আরও বিশদ জানতে পারবে। সালোকসংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা নিচের পরীক্ষার সাহায্যে বুঝতে পারবে।

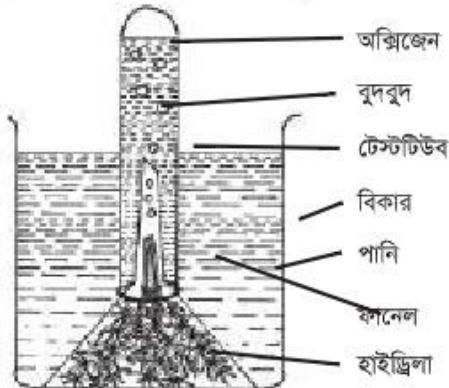
সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ: একটা বিকার, একটা ফানেল, একটা টেস্টটিউব, পানি, সতেজ জলজ উত্তিদ হাইড্রিলা ও একটা দিয়াশলাই।

কার্যপদ্ধতি:

বিকারটির দুই-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করি। সতেজ জলজ হাইড্রিলা উত্তিদগুলো বিকারের পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেই যাতে হাইড্রিলা উত্তিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে। এরপর বিকারে আরও পানি ঢালি যাতে ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে থাকে। এবার টেস্টটিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বৃক্ষাঙ্কুল দিয়ে বক্ষ করে ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উল্টিয়ে ছাপন করি যাতে টেস্টটিউবের পানি বের না হয়ে যায়। এরপর এসব কিছুকে সূর্যালোকে রাখি।

পর্যবেক্ষণ: কিছুক্ষণ পর দেখতে পাব হাইড্রিলা উত্তিদগুলোর কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্টটিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। টেস্টটিউবটা প্রায় সম্পূর্ণটা গ্যাসে পূর্ণ হলে, উল্টানো অবস্থায় টানেলের বাহিরে নিয়ে আসি। এবার দিয়াশলাইয়ের একটা সদ্য নিবন্ধ কাঠি টেস্টটিউবের মুখে প্রবেশ করালে, নিবন্ধ কাঠিটি দপ করে জুলে উঠবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা কেন দপ করে জুলে উঠল? এতে কী প্রমাণিত হয়?



চিত্র ৫.১ : সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পাঠ-৭ : জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই সূর্যালোক ও জীবন এর মধ্যে সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

খাদ্য উৎপাদন

১. জীবজগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য শর্করা একমাত্র সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
২. প্রাণী হোক আর উত্তিদ হোক জীবের কর্মচালগ্নের মূলে আছে খাদ্য। কারণ খাদ্যের সাথে শ্বসনের নিবিড় সম্পর্ক। শ্বসনের ফলে শক্তি নির্গত হয়। তাই তাপ শক্তি সরবরাহকারী শ্বসন প্রক্রিয়াটির উপর উত্তিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল।

পরিবেশে গ্যাস বিনিময়

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। ফলে থাণিকুলের জন্য ফতিকারক কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হয় এবং শব্দনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে সরবরাহ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে জীবনের অন্তিম সম্পূর্ণ নির্ভর করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বৃক্ষ হলে মানব সভ্যতা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। সে কারণে আমাদের উদ্ধিদ রক্ষায় আরও সচেতন হতে হবে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি গৃহীত হয় এবং গ্লোবার ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

নতুন শব্দ : সালোকসংশ্লেষণ ও শর্করা খাদ্য।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. শর্করা | খ. আমিষ |
| গ. মেহ | ঘ. ভিটামিন |

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিকালে হিমু মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। কিন্তু মাঠের মাঝে ঘাসের উপর একটি ইট পড়ে থাকতে দেখে। তখন সে ঘাসের উপর থেকে ইটটি সরিয়ে ফেলে এবং দেখে যে ইটের নিচের ঘাসগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ পাশের ঘাসগুলো সবুজই রয়ে গেছে।

২. পাশের ঘাসগুলো সবুজ থাকার কারণ-

- | | |
|------------------------|--------------|
| i. পানি | |
| ii. কার্বন ডাই-অক্সাইড | |
| iii. সূর্যের আলো | |
| নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

৩. যে প্রক্রিয়ার জন্য ঘাস বিবর্ণ হয়েছে তা -

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| i. অক্সিজেন সরবরাহ করে | |
| ii. জীবজগতের ভারসাম্য রাখা করে | |
| iii. কার্বন ডাই অক্সাইড সরবরাহ করে | |
| নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



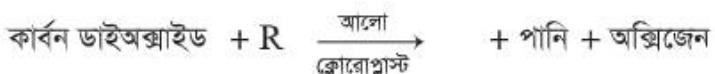
P- বেলজার



Q- বেলজার

- ক. সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?
- খ. সালোকসংশ্লেষণ প্রধানত উজ্জিদের পাতায় সংঘটিত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. P- বেলজারে মোমবাতিটি জুলে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. চিত্রে অদর্শিত অবস্থায় Q- বেলজারে গাছটি বেঁচে থাকবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



- ক. আলোক পর্যায় কাকে বলে ?
- খ. রাতে সালোকসংশ্লেষণ হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিক্রিয়ায় কীভাবে S যৌগটি তৈরি হয়? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. জীবজগতে উল্লিখিত বিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

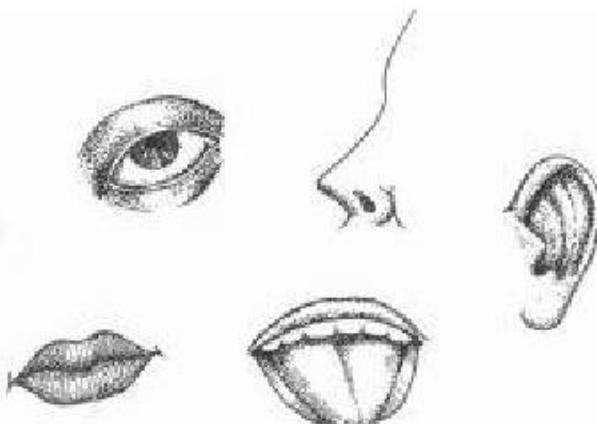
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। পাতা কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে? ব্যাখ্যা করো।
- ২। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উজ্জিদে অন্যান্য অংগের তুলনায় পাতায় বেশি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
- ৩। গ্যাসীয় আদান প্রদানের ক্ষেত্রে পাতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবেদী অঙ্গ

আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র। যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতেই অবাক লাগে। যন্ত্রের প্রতিটি অংশ মাপে মাপে বানানো। একটুও কম-বেশি নেই। আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে চলে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। কার কী কাজ সে আপনিই বুঝে নিচ্ছে। আমাদের কিছু বুঝার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। যেমন- চোখের দিকে সাঁই করে একটি মাছি উড়ে এল ওমনি চোখের পাতা গেল বন্ধ হয়ে। অসাবধানে গরম চুলায় হাত পড়লে, তুমি হাত সরিয়ে নেবে। পায়ে কাঁটা ফুটার সাথে সাথে ‘উঃ মাগো’ বলে কাতরাবে। সারা শরীর জেনে গেল কী একটা পায়ে বিধল। আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এ অধ্যায়ে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- সংবেদী অঙ্গসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সংবেদী অঙ্গের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সংবেদী অঙ্গের যন্ত্র নেওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবেদী অঙ্গের যন্ত্রের বিষয়ে নিজে সচেতন হব ও অন্যকে সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : সংবেদী অঙ্গ

আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো। সবাই বলে ওর মাথা ভালো। মাথা ভালো মানে মগজ ভালো। আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে আমরা মগজ বলে থাকি। আমাদের দেহের সব কাজই চলছে মস্তিষ্কের হৃকুমে। মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির ভিতর। খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় কীভাবে? চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা বাইরের সকল খবরা-খবর জোগাড় করে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, জিহ্বা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি, ত্বক দিয়ে গরম, ঠাণ্ডা, তাপ, চাপ অনুভব করি। এগুলো সংবেদী অঙ্গ। এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরাখবর। যেমন : তুমি রাস্তা পার হবে, হঠাৎ করে গাড়ি তোমার সামনে এসে পড়ল। তোমার চক্ষু তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে। মস্তিষ্ক তখন তোমার মাস্সপেশিদের বলবে দাঁড়িয়ে যাও, এখন রাস্তা পারাপারের দরকার নেই। অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে।

চোখ

আমরা চোখ দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু দেখতে পাই। চোখ কীভাবে গঠিত? মাথার সামনে দুটো অঙ্গ কোটরের মধ্যে এক জোড়া চোখ থাকে। ছয়টি পেশির সাহায্যে প্রতিটি চোখ অঙ্গ কোটরে আটকানো থাকে। এই পেশিগুলোর সাহায্যে অঙ্গগোলক নড়াচড়া করানো যায়। আমরা যাকে অঙ্গ বলি তা হলো চোখের পানি। এ অঙ্গ আসে কোথা থেকে? অশ্রুগুহি থেকে নিঃসৃত তরল যা চোখের পানি বা অঙ্গ নামে পরিচিত। অঙ্গ সবসময় চোখকে ভেজা রাখে, বাইরের ধূলোবালি ও জীবাণু পড়লে তা ধূয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। চোখের ত্বক স্বচ্ছ আর পেছনের অংশ কালো। তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ ও কাজগুলো নিম্নরূপ-

(১) চোখের পাতা : চোখের বাইরের আবরণ। চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এটা বন্ধ করে চোখকে ধূলোবালি থেকে রক্ষা করা যায়।

(২) কনজাংকটিভা : চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সে অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম কনজাংকটিভা। এই পর্দাটি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলেই তাকে কনজাংকটিভাইটিস বা চোখ উঠা রোগ বলে।

(৩) অঙ্গগোলক : এটি গোলাকার বলের মতো অঙ্গ। গোলকটি তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

ক) স্কেরা : অঙ্গগোলকের বাইরের সাদা, শক্ত ও পাতলা স্তরটি হলো স্কেরা। এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে। এর ভিতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না।

কর্নিয়া : স্কেরার সামনের চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া। এ অংশটি একেবারেই স্বচ্ছ। এর ভিতর দিয়েই আলো চোখের ভিতর প্রবেশ করে।

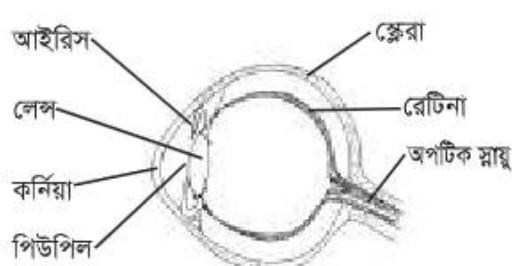
খ) কোরয়েড : স্কেরার স্তরের নিচের স্তরটি কোরয়েড। এটা একটা ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর। এখানে বহু রক্তবন্ধন প্রবেশ করে।

আইরিশ : কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে। একে আইরিশ বলে। এটি কোরয়েডের অংশ আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যাকে পিউপিল বলে। আইরিশ পেশি দিয়ে তৈরি। একে আমরা সাধারণত চোখের মণি বলে থাকি। আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। আইরিশের পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোটো বড়ো হতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করতে পারে।

লেপ : পিউপিলের পেছনে একটি বিউন্টল লেপ থাকে।

লেপটির মাঝখানের দুই দিক উচু আর আগাটা সরু।

লেপটি এক বিশেষ ধরনের সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে। এ পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এদের সংকোচন প্রসারণ দরকার মতো লেপের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।



ঝ) রেটিনা : রেটিনা অঙ্গগোলকের সবচেয়ে ভিতরের স্তর। এটি একটি আলোক সংবেদি স্তর। এখানে রড ও কোন নামে দুই ধরনের কোষ রয়েছে।

চিত্র ৬.১ : চোখের অঙ্গগঠন

চোখের লেপটি চক্ষু গোলককে সামনে ও পেছনে দুটি অংশে বিভক্ত করে। এই অংশগুলোকে প্রকোষ্ঠ বলে। সামনের প্রকোষ্ঠে জলীয় এবং পেছনের প্রকোষ্ঠে এক বিশেষ ধরনের জেলীর মতো তরল পদার্থ থাকে, যা চক্ষুগোলকে আলোকরণ্য প্রবেশ, পুষ্টি সরবরাহ এবং চক্ষুগোলকের আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চোখের যত্ন : চোখ একটি কোমল অঙ্গ, খুব যত্নে রাখতে হবে। ঠিকমতো যত্ন না নিলে চোখে নানা রকম অসুখ হতে পারে। যেভাবে চোখের যত্ন নেওয়া যায় তাহলো-

- ঘুম থেকে উঠে ও বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে চোখ দুটি পরিষ্কার করা।
- চোখ মোছার জন্য পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সবুজ শাকসবজি ও রাঙ্গিন ফলমূল খাওয়া। এগুলোতে ভিটামিন এ থাকে। এগুলো চোখের জন্য খুবই ভালো। এগুলো খেলে রাতকানা রোগ এড়ানো যায়।

কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে চোখের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের চোখের একটি চিত্র এঁকে এর অংশগুলোর নাম লেখো।

নতুন শব্দ : সংবেদী অঙ্গ, রেটিনা, লেপ, অফিগোলক, পিউপিল, আইরিশ, স্কেরা ও কনজাংকটিভ।

পাঠ ৪-৫ : কান

আমরা কী দিয়ে শুনি? আমরা কান দিয়ে শুনি। কান না থাকলে আমরা শুনতে পেতাম না। কথাও বলতে পারতাম না, কারণ কথা বলাটা তো শিখতে হয় শুনে শুনে।

আমাদের মাথার দুই পাশে দুটো কান বা কর্ণ আছে। কর্ণ বা কান আমাদের শুনতে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। আমাদের কান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. বহিঃকর্ণ, ২. মধ্যকর্ণ ও ৩. অন্তঃকর্ণ।

১। বহিঃকর্ণ : পিনা, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে বহিঃকর্ণ গঠিত।

(ক) **পিনা :** এটি কানের বাইরের অংশ। মাংস ও কোমলাছি দিয়ে গঠিত। শব্দ কর্ণকুহরে পাঠানো এর প্রধান কাজ।

(খ) **কর্ণকুহর :** পিনা একটি নালির সাথে যুক্ত। এ নালিটিকে কর্ণকুহর বলে।

(গ) **কর্ণপটহ :** কর্ণকুহর শেষ হয়েছে একটা পর্দায়। এ পর্দাটির নাম কর্ণপটহ বা টিমপেনিক পর্দা। কর্ণপটহ বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।



চিত্র ৬.২: কানের অন্তঃগঠন

২। মধ্যকর্ণ : বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝখানে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। এটা একটা বায়ুপূর্ণ থলি যার মধ্যে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামে তিনটি শুদ্ধ শুদ্ধ হাড় বা অঙ্গ রয়েছে। অঙ্গসমূহের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ বা চেউ অন্তঃকর্ণে পৌছায়। কানের সাথে গলার সংযোগের জন্য ইউস্টেশিয়ান টিউব নামে একটি নল আছে। এ নলটির কাজ হলো কর্ণপটহের বাইরের ও ভেতরের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

৩। অন্তঃকর্ণ : এটি অডিটরি ক্যাপসুল অঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(ক) ইউট্রিকুলাস : অন্তঃকর্ণের এ প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি দিয়ে গঠিত। এদের ভিতরে আছে খুব সূক্ষ্ম লোমের মতো স্নায় ও রস। নালির ভিতরের এ রস যখন নড়ে বা আন্দোলিত হয়, তখনই স্নায়গুলো উদ্বৃষ্ট হয়। আর তখনই সে উদ্বৃষ্টগুলো মণ্ডিকে পৌছায়। এই অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে।

(খ) স্যাকুলাস : অন্তঃকর্ণের এই প্রকোষ্ঠের চেহারা অনেকটা শামুকের মতো পঁয়াচানো নালিকার মতো। একে ককলিয়া বলে। ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদি কোষ থাকে। পঁয়াচানো নালিকা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে। এই অংশ শ্রবণের কাজ করে।

কানের যত্ন : কান আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়। কানের সমস্যার কারণে আমরা বধির হয়ে যেতে পারি। কানের যত্ন নেওয়ার জন্য যা করতে হবে, তাহলো-

- নিয়মিত কান পরিষ্কার করা।
- গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে সতর্ক থাকা।
- কানে বাইরের কোনো বস্তু বা পোকামাকড় ঢুকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- উচ্চ শব্দে গান না শুনা।

পাঠ- ৬

কাজ : মডেল বা চাটের সাহায্যে কানের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের কানের একটি চিত্র একে কানের অংশগুলোর নাম লেখো। বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করো।

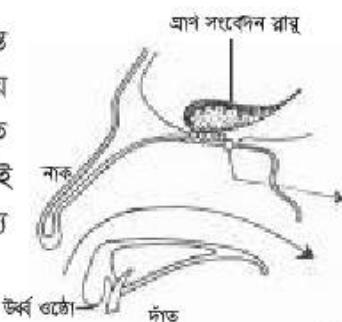
নতুন শব্দ : কর্ণপটহ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ, অর্ধবৃত্তাকার নালি ও ককলিয়া।

পাঠ- ৭ : নাক

নাক : আমরা নাক দিয়ে কোনটা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ তা অনুভব করতে পারি। নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নেই। ফুলের সুগন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করি আর পচা, ময়লা ও আবর্জনার গন্ধ পেলে নাকে কাপড় দেই। মুখ গহ্বরের উপরে নাক অবস্থিত। এর দুটো অংশ আছে, (১) নাসারঞ্জ ও (২) নাসাপথ।

১) **নাসারঞ্জ :** নাকের যে ছিদ্র দিয়ে বাতাস দেহের ভেতরে ঢোকে তাকে নাসারঞ্জ বলে।

(২) নাসাপথ : এটা নাসারক্ত থেকে গলার পেছন ভাগ বা গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গহ্বর। এ গহ্বরটি ড্রিকোণাকার। পাতলা প্রাচীর দিয়ে গহ্বরটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সামনের ভাগ লোম দ্বারা আবৃত থাকে ও পিছনের দিকটা পাতলা আবরণী বিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই বিল্লিকে আগবিল্লি বলা হয়। এতে থাকে সূক্ষ্ম রক্তনালিকা যা অসংখ্য আণকোষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

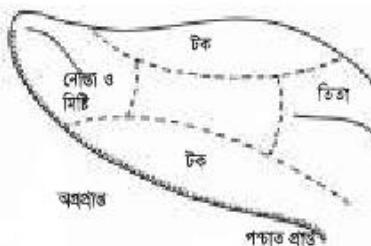


নাকের যত্ন : নাক দিয়ে আমরা আণ নিই। শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই, নাকের মধ্যে শ্লেংজ বিল্লির আবরণ থাকে। শিশুদের নাকের শ্লেংজের সাথে ধূলোবালি জমে, এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ঘাস্তসম্মত মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র ৬.৩: নাকের অস্তঃগঠন

জিহ্বা

রাকিবের খুব মিষ্টি পছন্দ। মিষ্টি দেখলে ওর জিভে পানি আসে। জিভ বা জিহ্বা দিয়ে আমরা খাদ্যবস্তুর টক, বাল, মিষ্টি, তিতা স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। এটা আমাদের স্বাদ ইন্দ্রিয়। মুখ গহ্বরে অবস্থিত লম্বা পেশিবহূল অঙ্গটি হল জিহ্বা। জিহ্বার উপরে একটি আস্তরণ আছে, এতে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বাদ কোরক থাকে।



চিত্র ৬.৪ : জিহ্বার গঠন ও স্বাদ অঞ্চল

- খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা।
- খাবার গিলতে সাহায্য করা।
- খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে দাঁতের নিকট পৌছে দেয়। ফলে খাদ্যবস্তু চিবানো সহজতর হয়।
- খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশ্রিত করতে সাহায্য করে।
- জিহ্বা আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে।

জিহ্বার যত্ন

খাদ্য পরিপাকের জন্য জিহ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বার যত্ন নিতে হলে যা করতে হবে তা হলো-

- দাঁত ব্রাশ করার সময় নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা।
- শিশুদের নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে জিহ্বায় ছাঁচাকের সংক্রমণ হতে পারে।
- অনেক রোগের কারণে জিহ্বার উপর সাদা বা হলদে পর্দা পড়ে। জ্বর হলে সাধারণত এটা হয়। এ সময় পানিতে লবণ গুলে কুলকুচি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- শিশুদের জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জিহ্বার উপর দইয়ের মতো দেখতে ছোটো ছোটো দাগ দেখা দেয়। এটা এক প্রকার ছাঁচাকের সংক্রমণ থেকে হয়।
- মুখ ও জিহ্বায় ঘা হলে অতি তাড়াতাড়ি ডাঙ্গারের পরামর্শ নিতে হবে।

নতুন শব্দ : স্বাদ কোরক, নাসাপথ ও গলবিল।

পাঠ-৮ : ত্বক ও ত্বকের যত্ন

আমরা শরীরের উপর দিয়ে পিপড়ে হেঁটে গেলে টের পাই। কোনো জিনিস গরম না ঠাণ্ডা তা বুঝতে পারি। কেউ তোমাকে ছুঁয়ে দিলে তাও বুঝতে পার। এগুলো কে করে? কীভাবে ঘটে? চর্ম বা ত্বকের সাহায্যে এগুলো ঘটে।

ত্বক বা চামড়া

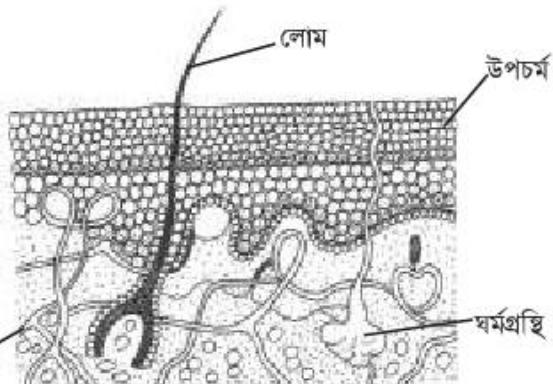
যেসব অঙ্গ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত, সেগুলো যাতে রোগজীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য সমস্ত দেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ত্বকই হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ। ত্বকের দুটি স্তর আছে, একটি উপচর্ম বা বহিঃত্বক এবং অন্যটি অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক।

উপচর্ম : উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাইরের আবরণ। হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া বা ত্বক খুব পুরু আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক পাতলা। এ উপচর্ম থেকেই লোম, চুল ও নখের উৎপত্তি হয়। উপচর্মে লোমকূপও রয়েছে।

অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক : অন্তঃত্বকে রয়েছে রক্তনালি ও স্নায়। এ ছাড়াও রয়েছে লোমের মূল, ঘর্মঘাস্তি, তেলঘাস্তি, স্বেদঘাস্তি ইত্যাদি। লোমহীন স্থানে অর্ধাং করতল ও পদতলে স্বেদঘাস্তির সংখ্যা বেশি থাকে।

ত্বকের সাধারণ কাজ

- দেহের ভিতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত, ঠাণ্ডা, গরম, রোদ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।
- দেহে রোগজীবাণু চুক্তে বাধা দেয়।
- ঘাম বের করে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ও সুস্থ রাখে।
- দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।
- সূর্য রশ্মি থেকে দেহকে রক্ষা করে।



চিত্র ৬.৫ : ত্বকের অনুচ্ছেদ

ত্বকের যত্ন

ত্বক আমাদের দেহের বাইরের আবরণ তৈরি করে। ত্বকের যত্ন নিতে হলে যা করা দরকার, তা হলো-

- নিয়মিত গোসল করা। নিয়মিত গোসল করলে ত্বক বা চামড়ার সংক্রমণ, খুশিকি, চুলকানি ইত্যাদি সমস্যা এড়ানো যায়।
- অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়। দুই-একদিন পরপর নিজের ব্যবহৃত তোয়ালে বা গামছা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
- ত্বকে কোনো রকম রোগ (যেমন- খোসপাঁচড়া, দাদ) দেখা দিলে ডাক্তারের পরমর্শ নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো মলম ব্যবহার করা যাবে না।

কাজ : মডেল বা চার্ট দেখে ত্বকের চিত্র অঙ্কন কর এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম-

- চোখের লেপ দ্বিতীয় ।
- সিলিয়ারি পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে লেপকে বাঁকাতে, গোল ও চ্যাপটা করতে পারে ।
- আইরিশ পেশি সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিল ছোট বড় করা যায় ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেহের সংবাদী অঙ্গ কোনটি?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. হাত | খ. পা |
| গ. চোখ | ঘ. মন্ত্রিক |

২. কোথায় ঘাম তৈরি হয়?

- | | |
|-----------------|-------------|
| ক. উপর্যুক্ত | খ. অঙ্গতৃকে |
| গ. ঘর্মগ্রাহিতে | ঘ. লোমকৃগে |

নিচের উক্তিগুলের আওতা ও নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

বারো বছর বয়সী রাতন অনিয়মিতভাবে গোসল করে, এমনকি গোসলের পর নির্দিষ্ট তোয়ালে ব্যবহার করে না ।
সম্প্রতি তার মাথায় খুশকির মাত্রা খুব বেড়েছে । এ ছাড়া তার গায়ে খোসপাঁচড়া হওয়ায় সে ফেরিওয়ালার কাছ
থেকে মলম কিনে মাথে ।

৩. রতনের মাথায় কীসের সমস্যা হয়েছে?

- | | |
|----------|---------------|
| ক. তৃকের | খ. চুলের |
| গ. গহ্নি | ঘ. মন্ত্রিকের |

৪. খোসপাঁচড়া যাতে না হয় সে জন্য রতনের -

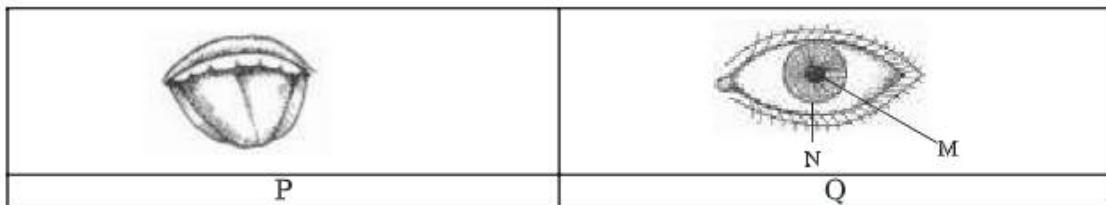
- i. নিয়মিত গোসল করতে হবে
- ii. পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে
- iii. যেকোনো মলম লাগাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

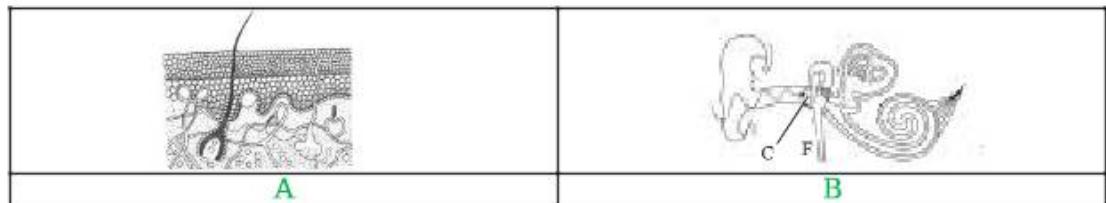
সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্বীপকের আলোকে প্রশ়ঙ্গলোর উভর দাও।



- ক. ক্লেরা কাকে বলে?
- খ. শিশুদের জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. P আমাদের কী করতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. Q এর M ও N অংশের ফাঁকিগুরুত্বের সম্মত ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্বীপকের আলোকে প্রশ়ঙ্গলোর উভর দাও।



- ক. সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে?
- খ. চোখের পাপড়ি না থাকলে কী ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্বীপকের A অংগের যত্ন নেওয়া প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্বীপকের B অংগের C ও F চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তার তুলনামূলক আলোচনা কর।

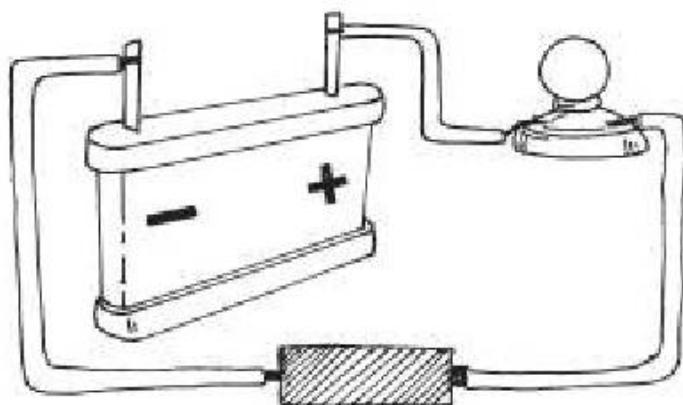
সংক্ষিপ্ত উভর প্রশ্ন

- ১। জিহ্বাকে কোন ধরনের ইন্দ্রিয় বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
- ২। চোখ উঠা রোগকে কনজাংকটিভাইটিস বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- ৩। মধ্যকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো।
- ৪। চোখের রেটিনার কাজ ব্যাখ্যা করো।
- ৫। চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গেলে কী ঘটবে?

সপ্তম অধ্যায়

পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক প্রভাব

লোহা, তামা, রবার, কাঠ ইত্যাদি হাজারো রকমের পদার্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন বলেই এদের একেকটি একেক কাজে ব্যবহৃত হয়।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু এবং অধাতুর কল্যাণকর দিক উপলক্ষি করব এবং এদের ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করতে পারব।
- গলনাক্ষ ও স্ফুটনাক্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে পদার্থের গলনাক্ষ এবং স্ফুটনাক্ষ নির্ণয় করতে পারব।
- থামা ঘড়ি ও থার্মোমিটার সুনিপুণভাবে ব্যবহারে সক্ষম হব।
- শীতলীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আঘাতে ধাতু এবং অধাতুর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

কোনো কিছু করতে গেলেই আমাদের নানা রকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত মুখ ধোয়ার জন্য পানি থেকে শুরু করে নানা রকম খাদ্যসামগ্ৰী, হাঁড়িপাতিল, কাপড়চোপড়, খেলনা, পাথৰ, সাইকেল, ফুটবল, মাৰ্বেল, বইপত্ৰসহ হাজারো রকমের জিনিস আমৰা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার কৰছি। এদের মধ্যে কোনোটি নৱম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি দেখতে চকচকে, কোনোটি গোল, কোনোটি চ্যাপটা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো সবই পদার্থ। এগুলো সবকয়টিই জায়গা দখল করে এবং প্রত্যেকেই ভৱ আছে। তাহলে আমৰা বলতে পাৰি যে, যা জায়গা দখল করে ও যার ভৱ আছে তাকেই পদার্থ বলে। পদার্থের কিছু অতিশুন্দৰ কণার আয়তন অবশ্য খুবই নগণ্য।

পৃথিবীতে হাজারো রকমের পদার্থ রয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাৱে শ্রেণিবিন্যাস কৰা হয়েছে। এৰ একটি শ্রেণিবিন্যাস হলো পদার্থের অবস্থার উপর ভিত্তি কৰে শ্রেণিবিন্যাস। একটি উদাহৰণ দেওয়া যাক। এক টুকুৱো বৱফ নিয়ে একটি পাত্ৰে রেখে দিলে কি ঘটে? এটি পানিতে পৱিণত হয়। আবাৰ ঐ পানিকে তাপ দিলে তা বাঞ্চে পৱিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পাৰে। আৱ তাহলো বৱফ, পানি আৱ বাঞ্চ। যখন বৱফ আকাৰে থাকে তখন এটিকে বলা হয় কঠিন অবস্থা। পানিৰ আকাৰে থাকলে তখন এটিকে বলা হয় তৱল অবস্থা আৱ বাঞ্চ আকাৰে থাকলে এটি হলো গ্যাসীয় অবস্থা। তাই অবস্থাভেদে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ কৰা যায়।



এখানে প্ৰশ্ন হলো কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি পদার্থ কঠিন, তৱল অথবা বায়বীয় হবে?

কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। কোনো বস্তু যতটুকু জায়গা দখল কৰে সেটিই ঐ বস্তুৰ আয়তন। সকল কঠিন বস্তুই জায়গা দখল কৰে, তাই সকল কঠিন বস্তুৱই আয়তন আছে। কঠিন পদার্থের আয়তন ও আকাৰ সহজে পৱিবৰ্তন কৰা যায় না। এৰা যথেষ্ট দৃঢ় অৰ্থাৎ এদেৱ দৃঢ়তা আছে। তবে কিছু কিছু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা কম যেমন : সৱিষার দানা, ভাত, কলা ইত্যাদি।

তৱল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। এটি যে পাত্ৰে রাখা হয় ঐ পাত্ৰের আকৃতি ধাৰণ কৰে। তৱল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কাৰণ কঠিন পদার্থের মতো এৰাও জায়গা দখল কৰে। এদেৱ আয়তন পৱিবাগ কৰা যায়। এই আয়তন কি পৱিবৰ্তন হয়? না, পাত্ৰভেদে আকৃতি পৱিবৰ্তন হলোও আয়তন কিন্তু একই থাকে। যেহেতু তৱল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, আকৃতি পৱিবৰ্তনশীল, সেহেতু বলা যায় যে এৰা কঠিন পদার্থের মতো দৃঢ় নয়। অৰ্থাৎ তৱল পদার্থের দৃঢ়তা নেই।

গ্যাসেৰ বৈশিষ্ট্য বোৰাৰ জন্য আমৰা বাতাসেৰ কথাই ধৰি। বাতাসেৰ কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। গ্যাসীয় পদার্থেৰ নির্দিষ্ট আয়তন আছে কি? তোমৰা দুটি সিলিঙ্গারেৰ কথা চিন্তা কৰ, যার একটি ছোটো আৱ একটি বড়ো। এখন যদি সমপৰিমাণ গ্যাস দুই সিলিঙ্গারে রাখ,

তাহলে তা ছোটো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেমন সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে, তেমনি একই পরিমাণ গ্যাস বড়ো সিলিন্ডারে রাখলেও তা সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে। তাহলে বলা যায় যে, একই পরিমাণ গ্যাস ছোটো পাত্রে রাখলে এর আয়তন কম হয় অথচ বড়ো পাত্রে রাখলে এর আয়তন বেশি হয়। অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন নেই। দৃঢ়তা তো নেই বটেই।

এ ছাড়া পদার্থকে যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা যায় তা হলো ঘনত্ব, কাঠিন্য, নমনীয়তা, তাপ পরিবাহিতা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

কাজ : তোমার বাড়ি ও স্কুল থেকে নিচের জিনিসগুলো সংগ্রহ করো।

চক, পেনসিল, লেটরবুক, রবার, ডাস্টার, হাতুড়ি, তারকাঁটা, সাবান, সাইকেলের চাকার স্প্রোক, ড্রিকেট ব্যাট, দিয়াশলাইয়ের বাক্স, লবণ, অ্যালুমিনিয়ামের থালাবাসন ও স্কুলের ঘণ্টা। এদের কোনো কোনোটা কাগজ, কাঠের ও ধাতুর তৈরি এবং কোন কোনোটা এসবের কোনোটা দিয়ে তৈরি নয়। কোনটি চকচক করে এবং কোনটি করে না সে অনুযায়ী এদের ভাগ করো।

কাঠিন্য ও নমনীয়তা

কোনো পদার্থ নরম, কোনোটা শক্ত, কোনোটা নমনীয়, কোনোটা অনমনীয়। নিজেরা নিচের কাজটি করো। এদের সম্পর্কে জানো।

কাজ : একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, একখণ্ড রবার, একখণ্ড কাঠ, মোমবাতি, এক টুকরা পাথর ও একটি প্যারেক নাও। এগুলোতে একটি ধাতব চাবি দিয়ে দাগ কেটে দেখ। কোনোটাতে খুব সহজে দাগ কাটা যায়। কোনোটাতে দাগ কাটা কঠিন। দুই আঙুলের মাঝে নিয়ে এদের প্রত্যেককে চাপ দিয়ে দেখ। দেখো কোনটা নমনীয়, কোনটা শক্ত ও অনমনীয়। এদের মধ্যে কোনটা খসখসে, কোনটা মসৃণ ও কোনটা ভঙ্গুর?

এবার নিচের মতো সারণি কর।

বস্তুর নাম	শক্ত	নরম	নমনীয়	অনমনীয়
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				

ঘনত্বের ভিত্তিতে পদার্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে দেখা গেছে ধাতুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা পদার্থের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৪- ৬ : ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৌলিক পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো ধাতু ও অন্যটি অধাতু। এখন আমরা ধাতু ও অধাতুর কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

ধাতু : অ্যালুমিনিয়ামের নানা রকম পাত্র, সোনার গহনা, তামার বৈদ্যুতিক তার -এগুলোকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এ পদার্থগুলো দেখতে কেমন? চকচকে। এটি হলো বেশিরভাগ ধাতুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে রান্নার কাজে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বা লোহার কড়াই ব্যবহার করি। কেন? কারণ এগুলো চুলার আগুন থেকে তাপ পরিবহন করে রান্নার মূল উপাদানে (যেমন-চাল বা মাছ) পৌছে দেয় ও উপাদানগুলো ঐ তাপে সিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ধাতুসমূহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা ভালোভাবে তাপ পরিবহণ করে। তাই এদের তাপ সুপরিবাহী বলে।

আবার বিদ্যুৎ পরিবহণে তামার তার ব্যবহার করার কারণ কী? বিদ্যুৎ পরিবহণ করা। অর্থাৎ, ধাতব পদার্থসমূহ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। এককথায় বলা যায়, ধাতু বা ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত দেখতে চকচকে, এবং এরা তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়।

অধাতু : তোমরা কি বলতে পারবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস দেখতে কেমন? বলতে পারবে না, কারণ ধাতুর মতো চকচকে বা এ জাতীয় চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য এদের নেই। আবার এগুলো ধাতুর ন্যায় তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনও করে না। তাই এদেরকে তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী বা অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়।

কাজ : তোমরা ম্যাগনেসিয়াম রিবন, দস্তার পাত, প্লাস্টিক, কাঠের ও স্টিলের ক্ষেত্রে রাখ ও ভালোভাবে লক্ষ কর কোনটি চক চক করে ও কোনটি করে না, এবং এই তথ্য ছকে লিপিবদ্ধ করো।

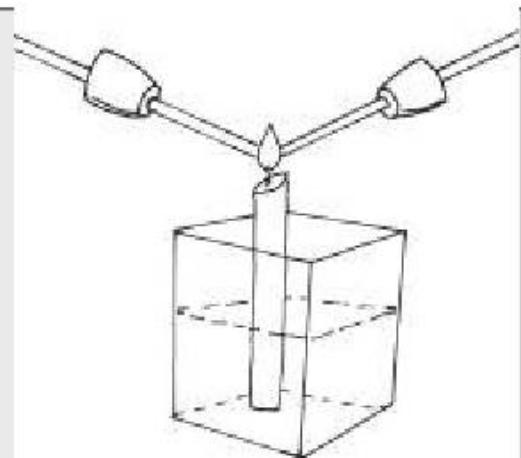
ছক

পদার্থের নাম	বৈশিষ্ট্য

কাজ : ধাতব পদার্থের (তামা) তাপ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তামার মোটা তার (২০ সেন্টিমিটার), দুটি কর্ক বা শোলার টুকরা, দিয়াশলাই, মোমবাতি বা স্প্রিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : কর্কের মধ্য দিয়ে তামার তার সর্তর্কতার সাথে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে একটি তারের মাঝ বরাবর থাকে। মোমবাতিটি জ্বালাও। তামার তারের এক প্রান্ত ধরে অপর থান্ত মোমবাতিটির শিখার উপর ধরো। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে গরম অনুভব না কর ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখো।



চিত্র ৭.১ : ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

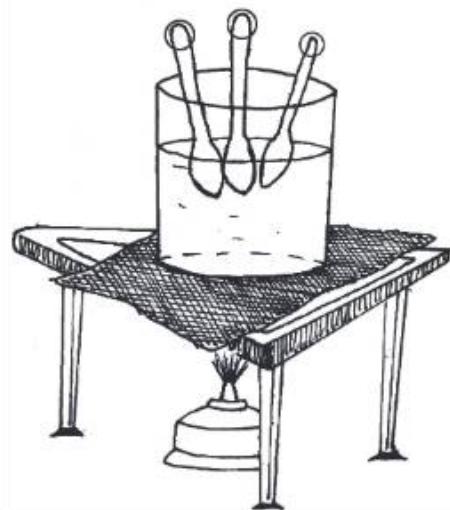
এখানে কর্ক ব্যবহারের কারণ কী? মোমবাতির শিখা থেকে সরাসরি তাপ যেন হাতে না লাগতে পারে সে জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তোমরা বল তাহলে তামার তারের যে প্রান্ত হাতে ধরে রেখেছ সেখানে গরম অনুভব করছ কেন? মোমবাতির শিখা থেকে তারের এক প্রান্ত তাপ গ্রহণ করছে এবং তামা তাপ সুপরিবাহী হওয়ায় তা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপর প্রান্তে পৌছেছে। যদি তা না হতো তাহলে তুমি হাতে গরম অনুভব করতে না। তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে তামা তাপ সুপরিবাহী। তামার মতো সকল ধাতুই তাপ পরিবহণ করে।

যে সমস্ত যন্ত্রে তাপ পরিবহন প্রয়োজন হয় (যেমন- রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, সৌরপ্যানেল ইত্যাদি) সে সমস্ত ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাই এদের সম্বৰ্ধার করা বা অপচয় রোধ করা আমাদের নেতৃত্বিক দায়িত্ব।

কাজ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের চামচ, ১টি প্লাস্টিকের চামচ, ১টি অ্যালুমিনিয়ামের চামচ, ৩টি ১ টাকার মুদ্রা, ১টি ৬০০ মিলিলিটারের বিকার, ৩০০ মিলিলিটার পানি ও স্প্রিট ল্যাম্প, মোম, দিয়াশলাই, থামা ঘড়ি।

পদ্ধতি : দিয়াশলাই জুলিয়ে মোমে অঙ্গ তাপ দিয়ে কিছুটা নরম হলে কিছু মোম প্রতিটি চামচের হাতলের উপর চাপ দিয়ে বসাও। এবার মুদ্রাগুলি মোমের উপর রেখে এমনভাবে চাপ দাও যাতে মুদ্রাগুলো চামচের সাথে লেগে থাকে। বিকারে ৩০০ মিলিলিটারের মতো পানি নাও। স্প্রিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। এখন চামচ তিনটিকে পৃথক পৃথক সূতা দিয়ে বেঁধে বিকারে এমনভাবে ডুবাও যাতে মুদ্রাগুলো বিকারের উপরিভাগের বাইরে থাকে। এবার স্প্রিট ল্যাম্প জুলিয়ে বিকারে তাপ দিতে থাক। মুদ্রাগুলোর দিকে চোখ রাখ। থামা ঘড়ির সাহায্যে কোন মুদ্রাটি চামচ থেকে আলাদা হতে কত সময় লাগে তা নিগয় কর।



চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

কোন চামচ থেকে সবার আগে, কোনটি থেকে সবার পরে মুদ্রা আলাদা হলো? আলাদাই বা হলো কেন? নিঃসন্দেহে অ্যালুমিনিয়ামের চামচ থেকে সবার আগে মুদ্রা আলাদা হলো, কারণ অ্যালুমিনিয়াম তাপ সুপরিবাহী বলে বিকারের গরম পানি থেকে তাপ তুলনামূলকভাবে দ্রুত পরিবাহিত করে মোমে পৌছায়। ফলে মোম গলে যায় এবং মুদ্রা মোম থেকে সবার আগে আলাদা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্লাস্টিকের তাপ পরিবাহিতা সবচেয়ে কম বলে প্লাস্টিকের চামচের গরম প্রান্ত থেকে তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে তাপ পরিবাহিত হয়ে ঠাণ্ডা প্রান্তে অর্থাৎ মোমের দিকে যায়। ফলে মোম গলতে সময় বেশি লাগে। আর সেকারণেই সবার পরে মোম থেকে মুদ্রা আলাদা হয়। আবার কাচের তাপ পরিবাহিতা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে কম কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি বলে প্লাস্টিকের চেয়ে দ্রুত কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ধীর গতিতে মোমে পৌছায়। ফলে কাচের চামচ থেকে মুদ্রা আলাদা হতে এলুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কম সময় লাগে।

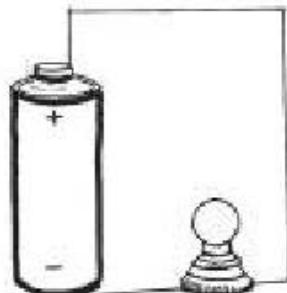
পাঠ ৭-৮ : ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

এর আগে তোমরা জেনেছ যে ধাতুসমূহ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা কুপরিবাহী হয়। এখন তোমরা নিজেরাই দেখবে কীভাবে ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।

কাজ : ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ব্যাটারি, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ২টি বৈদ্যুতিক তার, স্টিলের চামচ, অ্যালুমিনিয়ামের টুকরা, রবার, কাঠ ও প্লাস্টিকের চামচ।

পদ্ধতি : ব্যাটারিটি নাও ও দেখ এক প্রান্তে যোগ চিহ্ন (+) অপর প্রান্তে বিরোগ চিহ্ন (-) দেওয়া আছে। ১টি তামার তার ব্যাটারির এক প্রান্তে এবং অপরটি অপর প্রান্তে আটকিয়ে দাও (চিত্র ৭.৩-এর মতো)। তোমাদের যেকোন একজন বৈদ্যুতিক বাল্বটি নাও। লক্ষ কর বাল্বের যে প্রান্ত আমরা সকেটে প্রবেশ করাই সে প্রান্তে দুই পাশে একটু উঁচু করে বসানো দুটি ধাতব সংযোগ বিন্দু বা মোটা তারের মতো সংযোগ বিন্দু আছে। এবার দুটি তারের একটির খোলা প্রান্ত ঐ দুটি বিন্দুর একটিতে আর অপর তারটির খোলা প্রান্ত অপর সংযোগ বিন্দুতে আটকাও।



চিত্র ৭.৩ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

কী দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বাল্বটি জুলে উঠেছে। কারণ তামার তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পরিবহ করে বাল্বে পৌছে দেয়। আর সে কারণেই বাল্ব জুলে উঠে। যদি তামার তার বিদ্যুৎ পরিবাহী না হতো তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহণ হতো না, ফলে বাল্বও জুলত না। এবার তার দুটির সংযোগ খুলে এদের মাঝে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে সংযোগ দাও। দেখ কী ঘটে।

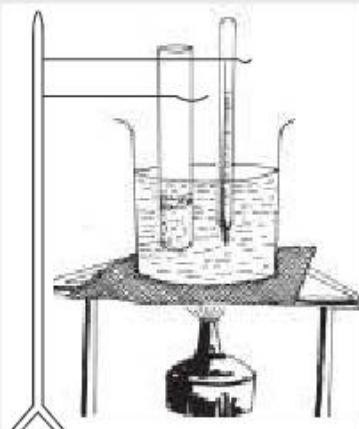
এরপর কাঠের টুকরা, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদি দিয়ে দুটো তারের সংযোগ কর। এখন কি বৈদ্যুতিক বাল্ব জুলছে? না জুলছে না। কারণ রবার, প্লাস্টিক ও কাঠের টুকরা বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ চার্জ পরিবহণ করতে পারছে না।

পাঠ ৯-১১ : গলনাক্ষ ও স্ফুটনাক্ষ

কাজ : কঠিন পদার্থের গলনাক্ষ সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, মোম, থার্মোমিটার, টেস্টচিটুব ও স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টচিটুবে কিছু ছেটো ছেটো মোমের টুকরা নাও। বিকারটিতে পানি নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রাখ। চিত্রের মতো করে স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে টেস্টচিটুব ও থার্মোমিটার বিকারের পানিতে ডুবাও যাতে এদের কোনটিই বিকারের তলা স্পর্শ না করে বা গায়ে না লাগে। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। থার্মোমিটারের ও টেস্টচিটুবে রাখা মোমের দিকে খেয়াল কর। থার্মোমিটারে কি তাপমাত্রা বাঢ়ছে? মোমের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? থার্মোমিটারে তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি আসলে মোমের অবস্থা খুব ভালোভাবে খেয়াল কর।



চিত্র ৭.৪ : গলনাক্ষ নির্ণয়

মোম কি গলে যাচ্ছে? মোম গলা শুরু হলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখ। কত আছে তাপমাত্রা? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? এই ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো মোমের গলনাক্ষ। তাহলে যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ গলে তরলে রূপান্তরিত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের গলনাক্ষ বলে। মোমের মতো প্রতিটি কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট গলনাক্ষ আছে। তোমরা বরফের গলনাক্ষ নির্ণয় কর।

স্ফুটনাক্ষ

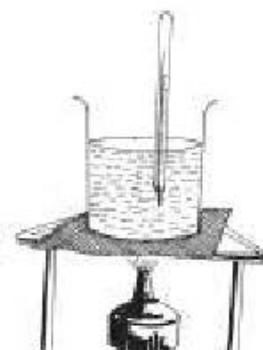
কোনো পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিতে থাকলে কী ঘটে? পানির তাপমাত্রা বাঢ়তে থাকে এবং একপর্যায়ে ফুটতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাই হলো এর স্ফুটনাক্ষ। পানির ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের একটি নির্দিষ্ট স্ফুটনাক্ষ আছে। চলো আমরা পানির স্ফুটনাক্ষ নির্ণয় করি।

কাজ : পানির স্ফুটনাক্ষ নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, পানি, থার্মোমিটার ও স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : পাত্রের অধৈক ভরে পানি নাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও।

চিত্রের মতো করে থার্মোমিটারটি পাত্রের পানিতে ডুবাও। এবার তাপ দাও, আর থার্মোমিটারে তাপমাত্রা লক্ষ্য কর। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সতর্কভাবে বিকারের পানি ও থার্মোমিটারের দিকে খেয়াল কর।



চিত্র ৭.৫ : স্ফুটনাক্ষ নির্ণয়

পানি ফুটতে শুরু করলে থার্মোমিটারের তাপমাত্রা দেখ। এই তাপমাত্রাই হলো পানির স্ফুটনাক্ষ। এই তাপমাত্রা কত? ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমরা ইথার বা স্পিরিটের স্ফুটনাক্ষ নির্ণয় করতে পার। তবে জৈবপদার্থ দাহ্য হওয়ায় সরাসরি তাপ দেওয়া যাবে না। একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ইথার বা স্পিরিটের বিকারটি রেখে তাপ দিতে হবে।

আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন

কাজ : আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার প্লেট, তামার পাত্র ও একটি হাতুড়ি।

পদ্ধতি : এক হাতে লোহার প্লেট নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? লোহার প্লেটটি কি আঘাতের ফলে ভেঙে গেল? একইভাবে তোমরা তামার পাত্রটি নিয়েও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? এবার গন্ধক ও কয়লা নিয়ে তাতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখ।

লোহার ও তামার প্লেটে আঘাতের ফলে ঝনঝন শব্দ হলো এবং ভাঙল না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আঘাতে ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত ঝনঝন শব্দ করে এবং খুব সহজে ভাঙে না। অর্থাৎ ধাতুসমূহ ভঙ্গুর নয়। অপর দিকে সালফার ও কার্বন ভেঙে যাবে এবং ঝনঝন শব্দ হবে না।

সাবধানতা: সালফার (গন্ধক) বা কার্বন (কয়লার ছোটো টুকরা) যেন চোখে না চুকে বা হাতে না লেগে যায়, সেজন্য নিরাপত্তা চশমা, হাতমোজা পরে নিতে হবে।

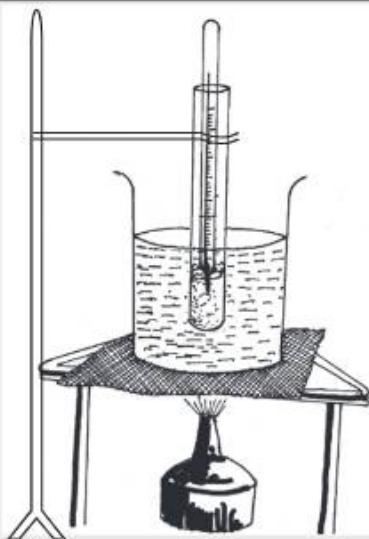
হিমাঙ্ক

আমরা জন্মদিনে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে মোমবাতি জ্বালাই। এখানে কী ঘটে? মোমবাতির একটি অংশ পুড়ে আলো দেয় আর আরেকটি অংশ আগ্নে গলে মোমবাতির গা বেয়ে পড়তে থাকে যা কিছুক্ষণ পরে আবার জমে কঠিন মোমে পরিণত হয়। তরল মোম থেকে কঠিন মোম হওয়ার প্রক্রিয়া হলো কঠিনীভবন। যে তাপমাত্রায় তরল মোম জমে কঠিন হয়ে যায় তাকে বলে এর হিমাঙ্ক। মোমের ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এমনটি হতে পারে।

কাজ : হিমাঙ্ক নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি টেস্টটিউব, ১টি বিকার, ১টি স্ট্যান্ড, কিছু মোম, পানি, ১টি থার্মোমিটার, স্প্রিংরিট ল্যাম্প, তারজালি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু মোম নাও। বিকারের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও। ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপরে বিকারটি বসাও। টেস্টটিউবটি বিকারের পানিতে চিত্রের মতো করে ঢুবাও। স্প্রিংরিট ল্যাম্প দিয়ে মোম পুরোপুরি না গলা পর্যন্ত বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। এবার থার্মোমিটার টেস্টটিউবের ভিতরে প্রবেশ করাও যাতে এর নিচের অংশ গলন্ত মোমে ঢুবে থাকে। থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটি বিকার থেকে তুলে এনে স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে রাখ। চিস্য পেপার দিয়ে টেস্টটিউবটি মুছে ফেল। থার্মোমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল কর। যে মুহূর্তে মোম জমে যাওয়া শুরু করল সেই মুহূর্তে তাপমাত্রা কত তা দেখে নাও।



চিত্র ৭.৬ : শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয়

কত তাপমাত্রায় মোম জমতে শুরু করল? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই তাপমাত্রা অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসই হলো মোমের হিমাঙ্ক। তোমরা মোমের গলনাঙ্কও পেয়েছিলে ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ একটি বন্ত গলনাঙ্কও হিমাঙ্ক একই। তোমরা বলতো পানির হিমাঙ্ক কত? শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে পানির গলনাঙ্কও কিন্তু শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কোনো একটি বন্ত তাপমাত্রা যদি হিমাঙ্কের উপরে থাকে এবং হিমাঙ্ক যদি পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় বন্তটিকে রেখে দিলে তা ধীরে ধীরে তাপ হারাতে থাকে, ফলে এর তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং যখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কে চলে আসে, তখন এটি কঠিনে পরিণত হয়। যেমনটি মোমের ক্ষেত্রে হয়েছে। মোম যখন তরল অবস্থায় ছিল, তখন এর তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল। মোমসহ টেস্টটিউবকে বিকার থেকে তুলে আনায় এটি ধীরে ধীরে তাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তাপমাত্রা কমতে থাকে, এভাবে কমতে কমতে যখন তা হিমাঙ্কে পৌছায় অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসে, তখন মোম জমে কঠিন অবস্থায় চলে আসে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- যার ভর আছে ও যা জায়গা দখল করে তাই পদার্থ। অবস্থাভেদে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় -এই তিনি রকম হয়।
- কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও দৃঢ়তা আছে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার ও দৃঢ়তা নেই।
- বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও দৃঢ়তা কোনোটিই নেই।
- মৌলিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু এই দুইরকম হয়। ধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয়। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এবং আঘাত করলে বানবান শব্দ হয়। ধাতুসমূহ সহজে ভাঙে না।

- অধিতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয় না। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না এবং আধাত করলে বানবন শব্দ করে না। অধিতুসমূহ সহজেই ভেঙে যায়।
 - যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাই হলো ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক। গলনাঙ্কও হিমাঙ্ক পরিমাণগতভাবে একই।
 - যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ বাল্পে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলে।

ନୟନା ପ୍ରଶ୍ନ

ବିଭିନ୍ନରୀଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

১. কোন পদার্থের দক্ষতা সবচেয়ে কম?

କ. ଇଟ
ଗ. କଲା

২. কোন পদার্থটি বোতলে রেখে দিলে সম্পূর্ণ বোতল জুড়ে থাকবে?

নিচের উদ্ধীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাথিনের মা	মাটির পাতিলে রাখা করেন
মাথিনের বাবা	তামার তারের ঘন্টা ব্যবহার করেন
মাথিনের দাদি	বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করেন
মাথিন	কাচের গ্লাসে পানি পান করেন

৩. ছকের কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জিনিসটি বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী?

ক. মাথিনের মার
গ. মাথিনের দাদির

খ. মাথিনের বাবার
ঘ. মাথিনের

৪. তাপ পরিবহিতার ক্ষেত্রে-

- i. মাথিনের ঘার চেয়ে বাবা বেশি সুবিধা পায়
 - ii. মাথিনের বাবার চেয়ে মাথিন বেশি সুবিধা পায়
 - iii. মাথিনের বাবার চেয়ে দাদি কম সুবিধা পায়

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

୫. ମିଶ୍ର କ୍ଷାମାଟି ସିଦ୍ଧାଂ ପରିବାଟି?

ক. রবার খ. কাঠ
গ. তালমিনিয়াম ঘ. পাসিংক

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ফজলুল হক সাহেবের মা মাটির চুলায় মাটির পাতিলে রাখা করেন। অপরদিকে তার শ্রী গ্যাসের চুলায় অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে রাখা করেন। তার মা তামার চামচ এবং শ্রী অ্যালুমিনিয়ামের চামচ ব্যবহার করেন।

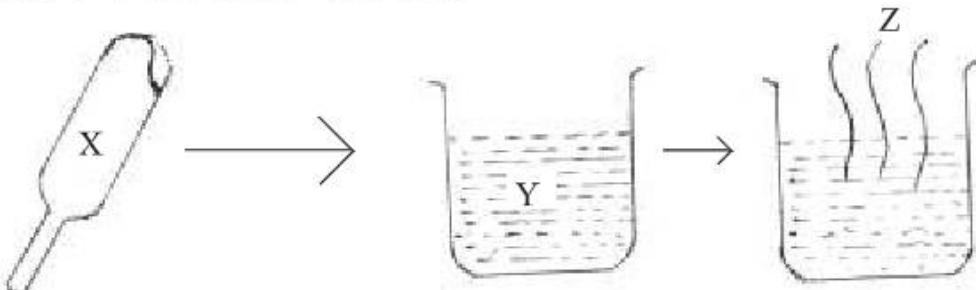
ক. গলনাক্ষ কী?

খ. ধাতু তাপ সুপরিবাহী কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের কোন ধাতুটি বৈদ্যুতিক তারে ব্যবহারের করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাখার ক্ষেত্রে ফজলুল হক সাহেবের মা ও শ্রীর মধ্যে কে বেশি সুবিধা পান বিশ্লেষণ করো।

২। নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:



ক. স্ফুটনাক্ষ কাকে বলে?

খ. তাপ পরিবাহিতা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের Z পদার্থের একই পরিমাণ দুটি ভিন্ন আয়তনের পাত্রে আবদ্ধ করলে পাত্রের সম্পূর্ণ আয়তন দখল করবে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. X, Y ও Z তিনটি পদার্থই একই উপাদানে গঠিত বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বরফের গলনাক্ষ শূন্য (০) ডিগ্রি সেলসিয়াস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো।

২. জৈব পদার্থকে সরাসরি তাপ প্রয়োগ করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. অ্যালুমিনিয়াম ধাতব পদার্থ কেন? ব্যাখ্যা করো।

অষ্টম অধ্যায়

মিশ্রণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা রকমের জিনিস ব্যবহার করে থাকি। এদের কোনোটি বিশুদ্ধ আর কোনোটি মিশ্রণ। মিশ্রণের মধ্যে আবার কোনোটি দ্রবণ, কোনোটি সাসপেনশন আর কোনোটি কলয়েড।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- মিশ্রণ এবং দ্রবণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- পানি এবং কঠিন পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণে তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সর্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার অদর্শন করতে পারব।
- সমসত্ত্ব এবং অসমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত এবং উপাদানসমূহ পৃথক করতে পারব।
- লবণাক্ত পানি হতে লবণের ফিটিক এবং বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনশনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে দ্রবণ ও সাসপেনশনের প্রয়োগ উপলব্ধি করব।
- পরীক্ষণ কাজের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ : মিশ্রণ এবং দ্রবণ

আমরা সকলেই চিনির শরবত ও ঝালমুড়ির সাথে কম বেশি পরিচিত। গ্লাসে বা জগে পানি নিয়ে তাতে কিছু চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়া দিলেই কিন্তু চিনির শরবত হয়ে যায়। আবার ঝালমুড়ি বানাতে হলে কিছু মুড়ি নিয়ে তাতে চানাচুর, কিছু পেঁয়াজ কুচি, মরিচের কুচি, টমেটো ইত্যাদি ভালোভাবে মিশাতে হয়। চিনির শরবত ও ঝালমুড়ি উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একের অধিক উপাদান আছে। এরকম একের অধিক বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকেই আমরা মিশ্রণ বলি। এই উপাদানগুলো মিশ্রিত থাকলেও, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে তাদের কাজগুলো পৃথক ভাবেই অবস্থান করে।

কাজ : দ্রবণ বা সমসত্ত্ব মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্লাস, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাসটি ভালোভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে নাও।

গ্লাসের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ খাওয়ার পানি নাও ও ১ চামচ চিনি যোগ করে নাড়া দাও। এবার চিনির শরবতটিকে কয়েক ভাগে ভাগ কর। প্রতিটি ভাগ থেকে এক চামচ করে থেঁরে দেখ।



চিত্র ৮.১ : দ্রবণ তৈরি

চিনিকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ কি? না, পাচ্ছ না। কারণ, চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। প্রতিটি ভাগ কি একই রকম মিষ্টি? হ্যাঁ, প্রতিটি ভাগ একই রকম মিষ্টি। কারণ হলো চিনির শরবতে চিনির কণাগুলো পানির সবখানে সুষমভাবে বা সমানভাবে বিন্যস্ত আছে।

চিনির শরবতের মতো যে সমস্ত মিশ্রণে উপাদানগুলো সুষমভাবে বণ্টিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাদেরকেই দ্রবণ বা সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয় অর্থাৎ দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ। এখন তোমরা পানিতে লবণ, পুরুষ, ফলের রস যোগ করে দেখ প্রাণ মিশ্রণগুলো সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ কি না।

কাজ : অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বাটি, মুড়ি, চানাচুর, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি ও টমেটো কুচি।

পদ্ধতি : তোমরা উপরের উপকরণগুলো মিশিয়ে ঝালমুড়ি বানাও। এবার ঝালমুড়িকে কয়েক ভাগে ভাগ কর।

তোমরা কি এই মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজে আলাদা করতে পারছ? হ্যাঁ, খুব সহজেই একটি উপাদান থেকে অন্যটি আলাদা করা যাচ্ছে। সব ভাগে কি সকল উপকরণ সমানভাবে আছে? না, নেই। কোনো ভাগে মুড়ি হয়তো একটু বেশি, কোনোটাতে বা পেঁয়াজ একটু বেশি আবার কোনোটাতে হয়তো চানাচুর একটু কম বা বেশি। অর্থাৎ উপাদানগুলো সুষমভাবে বণ্টিত নেই। ঝালমুড়ির মতো যে সকল মিশ্রণে উপাদানসমূহ সুষমভাবে বণ্টিত থাকে না এবং একটি থেকে অন্যটি সহজেই আলাদা করা যায়। তাদেরকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়।

এখন তোমরা পানিতে গুঁড়োদুধ, মাটি, আটা, চকের গুঁড়া, ট্যালকম পাউডার যোগ করে দেখ প্রাণ মিশ্রণগুলো অসমসত্ত্ব মিশ্রণ কিনা।

পাঠ ৩-৪ : দ্রব ও দ্রাবক

তোমরা বলতো চিনির শরবতে চিনি ও পানির মধ্যে কোনটি বেশি এবং কোনটি কম থাকে? নিঃসন্দেহে পানির পরিমাণ বেশি আর চিনির পরিমাণ কম থাকে। এখানে পানি চিনিকে দ্রবীভূত করেছে আর চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। দ্রবণে সাধারণত যেটি বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত করে, তাকে বলে দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় তাকে বলে দ্রব। তাহলে বলা যায় যে,

$$\text{দ্রবণ} = \text{দ্রব} + \text{দ্রাবক}$$

চিনির শরবতে দ্রাবক হলো পানি আর দ্রব হলো চিনি।

জলীয় দ্রবণ

উপরে দেওয়া চিনির শরবতের মতো জলীয় দ্রবণে পানি দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রবণের ক্ষেত্রেই দ্রাবক যে পানি হবে তা কিন্তু নয়। পানি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন এসিটোন, স্পিরিট, ইথারও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

দ্রবণের ঘনমাত্রা : পাতলা ও ঘন দ্রবণ

দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের পরিমাণ কম-বেশি করে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যায়। ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রবণকে পাতলা বা ঘন বলা হয়। এবার তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যাক।

কাজ : ঘন ও পাতলা দ্রবণ তৈরি ও পার্থক্যকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : দুটি কাচের গ্লাস, মাপচোঙ, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাস দুটি ভালোভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে নাও। প্রতিটি গ্লাসে মাপচোঙ দিয়ে যেপে ১০০ মিলিলিটার করে খাওয়ার পানি নাও।

একটি গ্লাসে ১ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়া দাও। এবার উভয় গ্লাস থেকে ১ চামচ করে দ্রবণ বা শরবত নিয়ে খেয়ে এদের মিষ্টতা পরীক্ষা কর।

(বিদ্র: বেশিরভাগ রাসায়নিক পদার্থই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই কোন দ্রবণ বা রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে পুরোপুরি জানা না থাকলে এটি খেয়ে স্বাদ পরীক্ষা করা কোনো মতেই উচিত নয়)।



চিত্র ৮.২ : পাতলা ও ঘন দ্রবণ তৈরি

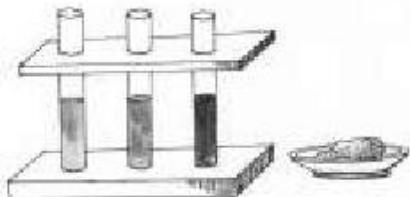
যে গ্লাসে ৩ চামচ চিনি দেওয়া হয়েছে, সেটি বেশি মিষ্টি লাগছে। চিনির শরবতের মতো সমান আয়তনের দ্রবণের ক্ষেত্রে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, সেটি ঘন দ্রবণ আর যেটিতে তুলনামূলকভাবে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে, সেটি হলো পাতলা দ্রবণ।

আবার যদি এমন হয় যে, দুটি শরবতে চিনির পরিমাণ একই রেখে (যেমন: ১ চামচ) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পানি নেওয়া হয় তবে যেটিতে পানির পরিমাণ কম থাকবে সেটি বেশি মিষ্টি হবে অর্থাৎ এটিকে আমরা ঘন দ্রবণ বলতে পারি। আর যেটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে, সেটি কম মিষ্টি হবে অর্থাৎ সেটিকে আমরা পাতলা দ্রবণ বলতে পারি।

বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ দেখে এটি পাতলা না ঘন তা বুঝার উপায় নেই। তবে রঙিন দ্রবণের ফ্রেঞ্চে ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণসমূহ কোনটি পাতলা, কোনটি ঘন তা বোঝা যায়, ঠিক যেমন করে আমরা পাতলা ডাল ও ঘন ডালের পার্থক্য করতে পারি (উল্লেখ্য, ডাল কিন্তু দ্রবণ নয়, একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ)। এখন আমরা দেখব কীভাবে ঘন ও পাতলা রঙিন দ্রবণের পার্থক্য করা যায়।

কাজ : ভিন্ন ঘনমাত্রার রঙিন জলীয় দ্রবণ তৈরি করে তা থেকে ঘন ও পাতলা দ্রবণের পার্থক্যকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তিনটি টেস্ট টিউব, টেস্টটিউব ধারক, মাপচোঙ, চামচ, তুঁতে ও পানি।



চিত্র ৮.৩ : রঙিন দ্রবণ তৈরি

পদ্ধতি : তিনটি পরিষ্কার টেস্টটিউব নাও। এবার টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউব-ধারকে পরপর সাজিয়ে রাখ। প্রতিটি টেস্টটিউবে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ৫ মিলিলিটার করে পানি নাও। প্রথম টেস্টটিউবে ১ চামচ, দ্বিতীয় টেস্টটিউবে ২ চামচ ও অপরাটিতে ৩ চামচ তুঁতে যোগ করে তুঁতের দানাগুলো পুরোপুরি পানিতে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ঝাঁকাও। টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউবধারকে ধার ধার জায়গায় আগের মতো সাজিয়ে রাখো।

তোমরা সবগুলো দ্রবণ কি সমান নীল দেখতে পাচ্ছ? না, তা নয়। যেটিতে সবচেয়ে কম পরিমাণ তুঁতে যোগ করেছ, সেটি সবচেয়ে কম নীল দেখাচ্ছে। অর্থাৎ সেটি সবচেয়ে পাতলা দ্রবণ। এভাবে তুঁতের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দ্রবণের রং আস্তে আস্তে গাঢ় হয়েছে অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা পাতলা থেকে ঘন হয়েছে। একই ভাবে তোমরা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেট ও পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণ তৈরি করে পাতলা ও ঘন দ্রবণের পার্থক্য করতে পার।

পাঠ ৫-৭ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

কাজ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, মাপচোঙ, নাড়ানি, লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকারটি ভালোভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে নাও। বিকারে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ১০০ মিলিলিটার পানি নাও। এবার বিকারের পানিতে অল্প অল্প করে লবণ যোগ করে নাড়ে থাকো। এভাবে লবণ যোগ করতেই থাকো আর নাড়তেই থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ করা লবণ অনেক নাড়লেও আর দ্রবীভূত না হয়।

ক্রমাগত লবণ যোগ করতে থাকলে একপর্যায়ে লবণ যোগ করে অনেক বেশি নাড়লেও লবণ আর দ্রবীভূত হয় না কেন? এর কারণ হলো লবণ যোগ করতে করতে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়েছে, যখন দ্রাবক (পানি) আর দ্রবকে (লবণকে) দ্রবীভূত করতে পারছে না। তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রবণে যদি ঐ সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তবে ঐ দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ হবে।

উপরের কাজে যোগকৃত লবণ অদ্রবীভূত হওয়ার আগের সকল অবস্থাকেই আমরা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে পারি। সম্পৃক্ত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ দ্রব যোগ করে অনেক নাড়লেও দ্রব আর দ্রবীভূত হয় না, পক্ষান্তরে অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব যোগ করে নাড়া দিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দ্রব দ্রবীভূত হতেই থাকে।

দ্রবণীয়তা

তোমরা উপরের অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত দ্রবণ কী তা জানলে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম দ্রাবক নিয়ে কোনো দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত গ্রাম দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ৩৬ গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে। অর্থাৎ 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা হলো ৩৬। আবার 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো ২১১.৪। অর্থাৎ 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ২১১.৪ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারে।

তরল-তরল দ্রবণ

যেসব দ্রবণে দ্রাবক হিসেবে তরল পদার্থ আর দ্রব হিসেবে কঠিন পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো তরল-কঠিন দ্রবণ। যদি এমন হয় যে, দ্রব ও দ্রাবক উভয়ই তরল পদার্থ তাহলে ঐ দ্রবণকে তরল-তরল দ্রবণ বলা হয়। আমরা এক গ্লাস পানি নিয়ে তাতে যদি এক চামচ লেবুর রস যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিই, তাহলেই একটি তরল-তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে। একইভাবে ভিনেগার বা এসিটিক অ্যাসিড ও পানি দিয়েও তরল-তরল দ্রবণ তৈরি করা যায়।

তরল-গ্যাস দ্রবণ

এবার আমরা কিছু দ্রবণ দেখি, যেখানে দ্রাবক হলো তরল পদার্থ আর দ্রব হলো গ্যাসীয় পদার্থ। কোমল পানীয় যেমন : কোকা কোলা, সেভেন আপ আমরা সবাই চিনি। এ সমস্ত কোমল পানীয়ের বোতল খোলার সাথে সাথে হিস শব্দ করে বুদ্বুদ আকারে গ্যাসীয় পদার্থ বের হয়। এ গ্যাসীয় পদার্থটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড যা পানীয়ের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ কোমল পানীয়গুলোকে আমরা তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে পারি।

তোমরা কি জান পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ (যেমন: মাছ) তাদের নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কোথা থেকে পায়? তারা তো আমাদের মতো সরাসরি বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ অক্সিজেন নেয় পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে। তাহলে নদ-নদী, খাল বিল বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানি কিন্তু এক ধরনের তরল-গ্যাস দ্রবণ। এই সমস্ত প্রাকৃতিক পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুই দ্রবীভূত থাকে।

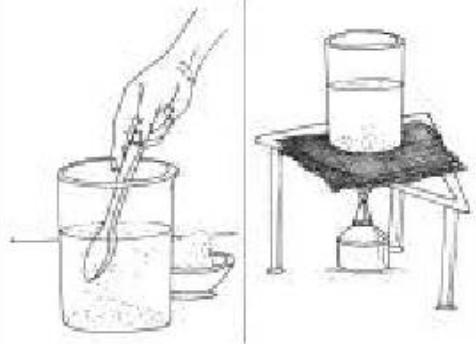
আবার ইদানীং বহুল সমালোচিত ফরমালিনও (যা আইন বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ফল ও মাছের সংরক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে) পানিতে ফরমালডিহাইড নামক গ্যাসের দ্রবণ।

দ্রবণে তাপের প্রভাব

কাজ : দ্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, নাড়ানি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, তারজালি, একটি নিক্তি, লবণ, পানি ও স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : একটি পরিকার বিকারে ১০০ গ্রাম পানি নিক্তি দিয়ে মেপে নাও। ধীরে ধীরে লবণ যোগ করে নাড়তে থাকো। যোগকৃত লবণ যদি আর দ্রবীভূত না হয়, তাহলে লবণ যোগ করা বন্ধ করো। এবার ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর বিকারটিকে বসাও এবং স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক ও নাড়তে থাকো।



চিত্র ৮.৪ : দ্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

তাপ দেওয়ার পর দ্রবণটিতে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আস্তে আস্তে অদ্রবীভূত লবণের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ তাপ দিতে থাকলে সম্পূর্ণ লবণই দ্রবীভূত হয়ে যাবে। তাহলে এটি বলা যায় যে, তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা বেড়েছে আর সে কারণেই অদ্রবীভূত লবণ তাপ দেয়ার পরে দ্রবীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু দ্রবণের ক্ষেত্রে (যেমন : পানিতে সিরিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রকার্বন) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রবণীয়তা কমে যায়।

পাঠ ৮-৯ : সর্বজনীন দ্রাবক

দ্রবণে দ্রাবক সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছ। সর্বজনীন দ্রাবক বলতে কী বুঝায়? এটি হবে এমন দ্রাবক, যা সব রকমের পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারবে। এরকম কোন দ্রাবক কি বাস্তবে পাওয়া সম্ভব? সম্ভবত নয়। তবে অনেক রকমের পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে এমন একমাত্র দ্রাবক হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত পানি। অর্থাৎ পানিই হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র সর্বজনীন দ্রাবক। পানি একদিকে যেমন অসংখ্য অজৈব পদার্থকে (ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা ইত্যাদি ছাড়া) দ্রবীভূত করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে অনেক জৈব যৌগ (যেমন স্পিরিট, এসিটোন, এসিটিক অ্যাসিড) ও গ্যাসীয় পদার্থকেও দ্রবীভূত করতে পারে।

হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন নানারকম জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে তোমরা পানিতে এদের দ্রবণীয়তা পরীক্ষা করে দেখ।

সমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা সমসত্ত্ব মিশ্রণের কিছু উদাহরণ দেখেছি। এখন দেখব কীভাবে এ সকল মিশ্রণ প্রস্তুত ও তাদের উপাদানসমূহকে পৃথক করা যায়।

কাজ : সমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, চামচ, নাড়নি, গুকোজ ও পানি, চারটি ওয়াচ গ্লাস বা কাচের ছোটো পাত্র পদ্ধতি : বিকারটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) পানি মাপচোঙ দিয়ে মেপে নাও। এবার ৪-৫ চামচ গুকোজ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। গুকোজ ও পানির মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। পুরো মিশ্রণটিকে সমান চার ভাগে ভাগ ও চারটি ওয়াচ গ্লাসে রাখো। প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের আলাদা আলাদা ভর মেপে নাও ও লিখে রাখো। এবার প্রতিটি ওয়াচ গ্লাস ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলো। ওয়াচ গ্লাসগুলোকে ঠাণ্ডা করে প্রতিটির ভর মেপে নাও। প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের পরের ভর ও আগের ভরের পার্থক্য থেকে প্রাপ্ত গুকোজের ভর হিসেব করো।

দ্রবণে গুকোজের কণাগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? না, মোটেও না। কারণ গুকোজের দানাগুলো সম্পূর্ণরূপে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এবার পানি শুকানোর পর তোমরা প্রতিটি পাত্রে সমান পরিমাণ গুকোজ পেয়েছ কি? হ্যাঁ, প্রতিটি পাত্রে পাওয়া গুকোজের পরিমাণ সমান। অতএব বলা যায় যে পানি ও গুকোজের মিশ্রণটি সমসত্ত্ব ছিল। তা না হলে কোনো ভাগে গুকোজ বেশি আবার কোনোটাতে কম পাওয়া যেত।

যে প্রক্রিয়ায় তাপ দিয়ে পানি শুকিয়ে ফেললে তার নাম জান কি? এটি হলো বাস্পীভবন। অর্থাৎ তাপ দিয়ে তরল পদার্থকে বাস্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই বাস্পীভবন বলে। তোমাদের কি মনে হয় বাস্পীভবন ছাড়া আর কোনো সহজ পদ্ধতিতে গুকোজকে পানি থেকে আলাদা করা যাবে? না, এটিই একমাত্র উপায়, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

অসমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ

কাজ : অপরিষ্কার লবণ ও পানির অসমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার বা কাচের গ্লাস, চামচ, নাড়নি, অপরিষ্কার লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকার বা কাচের গ্লাসটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) পানি নাও। এবার ১-২ চামচ অপরিষ্কার লবণ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ রেখে দাও।

কী দেখতে পাচ্ছ? লবণের কণাগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে আর ময়লার ভারী কণাগুলো বিকারের তলায় জমতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ময়লার হালকা ও শুন্দি শুন্দি কণাগুলো পানিতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। ময়লার কণাগুলো পানিতে সুস্থমভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে না অর্থাৎ এটি নিশ্চিত যে মিশ্রণটি লবণ-পানি-ময়লার একটি অসমসত্ত্ব নিশ্চণ।

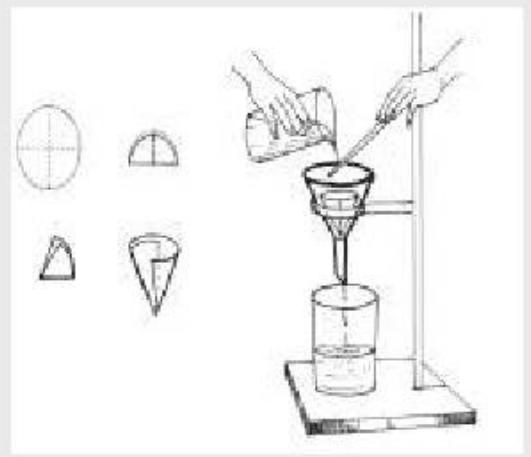
ময়লার কণাগুলো যে সুস্থমভাবে বিন্যস্ত নয় সেটি কীভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়? আগের কাজের মতো সমান কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে পানি পুরোপুরি বাস্পায়িত করে প্রতি ভাগে অবশিষ্ট বস্তুর ভর পরিমাপ করলেই দেখা যাবে একেক ভাগে একেক পরিমাণ বস্তু রয়েছে।

বলতো এই মিশ্রণ থেকে আমরা কি কোনোভাবে অন্দরবগীয় ময়লার কণা দূর করতে পারি? হাঁকুনি দিয়ে চা পাতা যেভাবে লিকার থেকে আলাদা করা হয়, ঠিক একইভাবে আমরা অন্দরবগীয় বস্তুর কণাগুলোকেও মিশ্রণ থেকে আলাদা করতে পারি। এবার দেখে নিই কীভাবে ফিল্টার কাগজ দিয়ে ময়লার কণাগুলো লবণ পানি থেকে আলাদা করে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায়।

কাজ : অপরিষ্কার লবণ হতে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : অপরিষ্কার লবণের অসমসত্ত্ব মিশ্রণ, নাড়ানি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিংযুক্ত স্ট্যান্ড ও পানি।

পদ্ধতি : একটি ফিল্টার কাগজ নিয়ে প্রথমে সমান চার ভাঁজ করো। এরপর চিত্রের মতো করে একদিকে তিন ভাঁজ ও অন্যদিকে এক ভাঁজ রেখে ফানেলের ভিতরে বসিয়ে দাও। ফিল্টার কাগজটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে অল্প করে ভিজিয়ে নাও যাতে এটি সরে না যায়। ফানেলটি চির অনুযায়ী স্ট্যান্ডের সাথে যুক্ত রিংয়ের উপর বসাও। ফানেলের নিচে একটি বিকার রাখ। অতঃপর আগের কাজের অপরিষ্কার লবণের অসমসত্ত্ব মিশ্রণটি ফিল্টার পেপারের উপর আন্তে আন্তে ঢেলে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত ফানেল থেকে পরিষ্কার পানি পড়া শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এবার পরিষ্কার লবণ-পানির বিকারটিকে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে ফেলো।



চির ৮.৫ : পরিষ্কারণ

মিশ্রণটি ফানেলে ঢালার পর কী ঘটল? মাটির কণামুক্ত পরিষ্কার লবণ-পানি ধীরে ধীরে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচে রাখা বিকারে জমা হলো আর মাটির কণাগুলো ফিল্টার কাগজের উপরে আটকে রইল। মাটির কণাগুলোকে ফিল্টার কাগজ দিয়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে আলাদা করার এই প্রক্রিয়ার নাম হলো পরিষ্কারণ অথবা পরিষ্কারণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায়।

বিকারের পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর তোমরা কী পেলে? সাদা ধৰ্বধৰে ও পরিষ্কার লবণের স্তর পেয়েছ। কারণ শুরুতে নেওয়া ময়লাযুক্ত লবণ থেকে সকল ময়লা ফিল্টার কাগজ দিয়ে পরিষ্কারণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে। মনে রেখো ময়লার মধ্যে যদি পানিতে দ্রবণীয় কোন অংশ থাকে তাহলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সেই অংশকে লবণ থেকে আলাদা করা যাবে না।

পাঠ ১০-১২ : লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণ

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে পরিষ্কারণ ও বাস্তীভবনের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুতপ্রণালি দেখেছি। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত লবণ কিন্তু দানাদার ছিল না, ছিল লবণের স্তর যা মূলত অদানাদার লবণ। এখন আমরা লবণাক্ত পানি হতে দানাদার লবণ অর্থাৎ লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণের কৌশল দেখব।

কাজ : লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, চামচ, নাড়ানি, ত্রিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিং যুক্ত স্ট্যান্ড, কিছু অপরিক্ষার লবণ ও পানি।

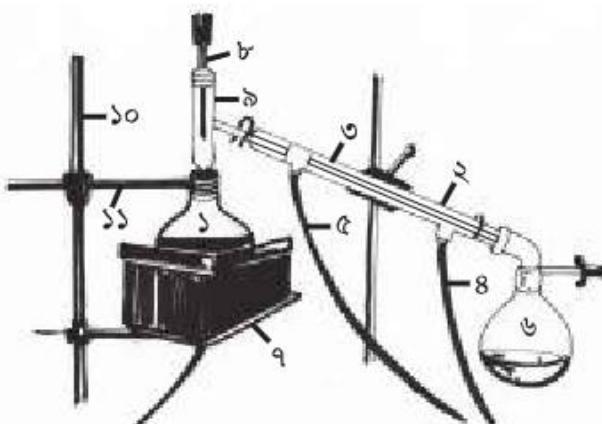
পদ্ধতি : একটি বিকারে ২০০ মিলিলিটার পানি ও ৫০ গ্রাম অপরিক্ষার লবণের একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিস্থাবণের মাধ্যমে পরিক্ষার লবণ-পানির দ্রবণ অর্থাৎ লবণাক্ত পানি বানাও। এবার লবণাক্ত পানি একটি বিকারে নিয়ে বিকারকে ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে তাপ দিতে থাকো। তাপ দিতে দিতে বিকারে লবণাক্ত পানির আয়তন প্রায় অর্ধেকে পরিণত হলে তাপ দেওয়া বন্ধ করো। অতঃপর বিকারে একটি ঢাকনা দিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য রেখে দাও।

বিকারটি ঠাণ্ডা হওয়ার পরে তোমরা কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? বিকারের তলায় বা গায়ে লবণের দানা জমা হতে শুরু করেছে। এই দানাযুক্ত লবণই হলো লবণের স্ফটিক। লবণের স্ফটিক তৈরির এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্ফটিকীকরণ। অনেক সময় লবণাক্ত পানি হতে স্ফটিক পাওয়ার জন্য এতে দুই একটি লবণের দানা বাইরে থেকে যোগ করতে হয়। এতে যোগকৃত লবণ দানাকে ঘিরে খুব দ্রুত দানাদার লবণ জমা হতে থাকে।

লবণাক্ত পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ

লবণাক্ত পানি অথবা যেকোনো মিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে পাতন পদ্ধতি, যার জন্য প্রয়োজন একটি পাতন যন্ত্র। চিত্র-৮.৬ এ একটি পাতন যন্ত্র দেখানো হলো :

পাতন যন্ত্রটির বাম পাশে রয়েছে পরীক্ষাধীন লবণাক্ত পানি নেওয়ার জন্য একটি গোলতলী ফ্লাস্ক (১)। এর সাথে সংযুক্ত আছে একটি শীতক (condenser) (২) যার ভিতরে একটি সরু কাচের নল (৩) বসানো আছে এবং ঐ নলের চারপাশে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহের জন্য একটি প্রবেশ নল (৪) ও একটি নির্গমন নল



চিত্র ৮.৬ : পাতন যন্ত্র

(৫) আছে। আর ডান পাশে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করার জন্য আছে আরেকটি গ্রাহক ফ্লাস্ক (৬)। এছাড়া পানিতে তাপ দেওয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিক হিটার (৭) আর তাপমাত্রা মাপার জন্য বাম পাশের ফ্লাস্কের উপরে থার্মোমিটার (৮) বসানোর জন্য ও শীতকের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি কাচের এডাপ্টার (৯) রয়েছে। এছাড়া ফ্লাস্ক দুটি ও শীতককে সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য স্ট্যান্ড (১০) ও ক্ল্যাম্প (১১) রয়েছে। এবার দেখা যাক পাতন যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে।

কাজ : লবণ্যাত্মক পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি পাতন যত্র, ৫০০ মিলিলিটার লবণ্যাত্মক পানি।

পদ্ধতি : চিত্র ৮.৬ এর মতো করে পাতন যত্রটি সাজিয়ে গোলতলী ফ্লাস্ক (১) এ লবণ্যাত্মক পানি নাও। পাতন যত্রটির পানি প্রবেশের নলটি (৪) একটি পানির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করে পানির প্রবাহ চালু করো। পানি নির্গমণের নলের সাথে একটি প্লাস্টিকের পাইপ যুক্ত করে বেসিনে রাখো। এবার বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে ফ্লাস্কে তাপ দিতে থাকো। বৈদ্যুতিক হিটারের ব্যবস্থা না থাকলে স্পিরিট ল্যাম্প বা অন্য যেকোনো উপায়ে তাপ দেওয়া যেতে পারে। পাতন যত্রের থার্মোমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল করো। বাস্পীভূত পানি শীতকের সরু নলের মধ্য দিয়ে গ্রাহক ফ্লাস্কে (৬) জমা হতে শুরু করলে অপেক্ষা করতে থাকো। গোলতলী ফ্লাস্ক (১) এ পানির পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশ কমে গেলে তাপ দেয়া বন্ধ করো।

তাপ দেয়ার পর কী ঘটে? থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি ফুটতে শুরু করে ও বাস্পে পরিণত হয়। উক্ত বাস্প শীতকে প্রবেশ করলে ঠাণ্ডা হয়ে তা তরলে পরিণত হয়। বাস্প তরলে পরিণত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। ঘনীভূত পানি ফেঁটায় ফেঁটায় গ্রাহক ফ্লাস্কে জমা হতে থাকে। এই জমা হওয়া পানিই বিশুদ্ধ পানি।

তাহলে দেখো যাচ্ছে, পানির কোনো মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে আমাদের দুটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এদের একটি হলো বাস্পীভূত আর অন্যটি ঘনীভবন। তোমরা কি এখন সমন্বের পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে পারবে?

সাসপেন্সন ও কলয়েড

কাজ : সাসপেন্সন তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের প্লাস, চামচ, কাদামাটি ও পানি।

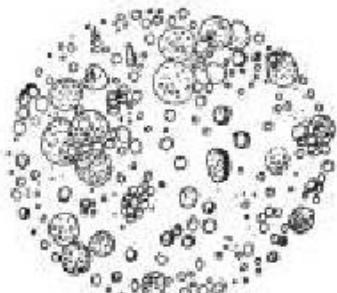
পদ্ধতি : কাচের প্লাসের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও। ১ চামচ পরিমাণ কাদামাটি প্লাসে যোগ করে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও।

কী দেখতে পাচ্ছ? প্রথমে পুরো মিশ্রণটি ঘোলা দেখাচ্ছে। রেখে দেওয়ার পর তুলনামূলকভাবে ভারি মাটির কণাগুলো প্লাসের তলায় জমা হচ্ছে, তবে কিছু কিছু মাটির কণা যেগুলো খুব হাঙ্গা ও ছোটো ছোটো তারা পানিতে ভাসমান অবস্থায়ই থাকছে আর মিশ্রণটি অঙ্গ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। আরও কিছু সময় মিশ্রণটি কোনো নাড়াচড়া না করলে, মিশ্রণটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, মাটির আরও কিছু ক্ষুদ্র কণা তলায় জমা পড়ছে তবে পানি পুরোপুরি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ কিছু কিছু ক্ষুদ্র কণা তখনও পানিতে ভাসমান অবস্থায় থেকেই যাচ্ছে। মাটি ও পানির এ জাতীয় মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আঁশিক আলাদা হয়ে যায় তাকেই সাসপেন্সন বলে। একইভাবে, চক মিহি করে গুঁড়া করে বা আটা পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় সেগুলোও সাসপেন্সন। আমরা বাড়িতে যে সকল এন্টিবায়োটিক বা এন্টিসিডের সাসপেন্সন ব্যবহার করি, সেগুলোও রেখে দিলে আঁশিক আলাদা হয়ে যায় ও গুষ্ঠের বোতলের নিচে তলানি পড়ে যায়। তাই গুষ্ঠ সেবনের পূর্বে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়।

এবার তোমরা দ্রবণ, সাসপেন্সন ও অসমস্ত মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছ কি? অসমস্ত মিশ্রণে উপকরণগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও আলাদা করা যায়। সাসপেন্সনের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিতও করা যায় না, সহজে আলাদাও করা যায় না।

এবার আসা যাক কলয়েডের কথায়। সাসপেন্সনের বেলায় আমরা দেখলাম, একটি উপকরণের ছোটো ছোটো কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ রেখে দিলে তা তলানি হিসেবে জমা পড়ে। কিন্তু এমন কি হতে পারে না যে, কণাগুলো এতই ক্ষুদ্র ও হাঙ্কা যে তারা কখনই পাত্রের তলায় জমা হতে পারবে না, সব সময়ই ভাসমান বা সাসপেন্ডেড অবস্থায়ই থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই পারে, আর সে ধরনের মিশ্রণ যেখানে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকণা অপর বস্তুকণার মাঝে সাসপেন্ডেড বা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং রেখে দিলে কখনই কোনো তলানি পড়ে না তাকে বলা হয় কলয়েড।

কলয়েডে বিদ্যমান উপাদানগুলো একটি আরেকটিতে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ছড়িয়ে থাকে। কলয়েডে যেটি প্রধান উপাদান বা পরিমাণে বেশি থাকে, তাকে বলে অবিচ্ছিন্ন ফেজ বা দশা আর যেটি কম পরিমাণে থাকে বা ছড়িয়ে থাকে, তাকে বলে ডিসপারসড ফেজ বা দশা। যেমন: দুধ হচ্ছে একটি কলয়েড, যা পানি ও চর্বি দিয়ে তৈরি। চর্বির ক্ষুদ্র কণাগুলো পানিতে ছড়িয়ে থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিকই দেখা যায়। চিত্র-৮.৭ এ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া দুধের একটি ছবি দেখানো হলো।



চিত্র ৮.৭ : কলয়েড

দুধের মতো কুয়াশা হচ্ছে আরেকটি কলয়েড, যেখানে পানির ছোটো ছোটো কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। আবার আমাদের অতি পরিচিত অ্যারোসলও কিন্তু এক ধরনের কলয়েড, যেখানে তরল কীটনাশকের কণাগুলো বাতাসে ডেসে থাকে। এখন থ্রু হতে পারে যে কলয়েড তৈরির জন্য ভাসমান ক্ষুদ্র কণাগুলোর আকার কত ছোট হতে হবে? সাধারণত কলয়েডে বিদ্যমান ভাসমান কণাগুলোর আকার ১-১০০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। আর যদি কণাগুলোর আকার ১ মাইক্রোমিটার বা তার বেশি হয়, তখন এটি আর কলয়েড না হয়ে সাসপেন্সনে পরিণত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- একের অধিক বিশুদ্ধ পদার্থ মিশ্রণ তৈরি হয়।
- দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ, যেখানে দ্রব দ্রাবকে সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে ও একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায় না।
- অসমসত্ত্ব মিশ্রণে উপাদানগুলি মিশ্রণের সর্বত্র সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে না এবং একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায়।
- দ্রবগে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত করে সেটি হলো দ্রাবক আর যে উপাদানটি কম পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত হয় সেটি হলো দ্রব।
- সমপরিমাণ দুটি দ্রবগের মধ্যে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে তার ঘনমাত্রা বেশি হয়। সম্পৃক্ত দ্রবগে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।
- ১০০ গ্রাম দ্রাবকে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে।

- তাপ দিলে কোনো কোনো দ্রবণের দ্রবণীয়তা বাড়ে আবার কোনো কোনো দ্রবণের দ্রবণীয়তা কমে।
- পরিস্থিতি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের অসম্মত মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহকে আলাদা করা যায়।
- তাপের প্রভাবে তরল পদার্থকে বাস্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাস্পীভবন বলা হয়।
- ঘনীভবন হলো বাস্পকে শীতল করে তরলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।
- সাসপেন্সন হলো এমন একটি মিশ্রণ, যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আংশিকভাবে আলাদা হয়ে যায়।
- কলয়েড এক ধরনের মিশ্রণ, যেখানে একটি উপাদানের ক্ষুদ্র কণা অন্য উপাদানে ছড়িয়ে থাকে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি তরল-গ্যাস দ্রবণ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. লেবুর শরবত | খ. কোমল পানীয় |
| গ. ভিনেগার | ঘ. স্যালাইন |

২. কোনটি কলয়েড?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. চক ও পানি | খ. আটা ও পানি |
| গ. চর্বি ও পানি | ঘ. মাটি ও পানি |

উদ্বীগকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কক্ষ তাপমাত্রায় সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণীয়তা ২১.৬।

৩. কক্ষ তাপমাত্রায় ২০০ গ্রাম পানি নিয়ে সোডিয়াম কার্বনেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কতটুকু সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ২.১৬ গ্রাম | খ. ৪.৩২ গ্রাম |
| গ. ২১.৬ গ্রাম | ঘ. ৪৩.২ গ্রাম |

৪. সোডিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ যদি ১০ গ্রাম কম হয় তবে দ্রবণটি-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ক. সম্পৃক্ত দ্রবণ | খ. অসম্পৃক্ত দ্রবণ |
| গ. সাসপেন্সন | ঘ. কলয়েড |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. কর্তব্যাজারে সমুদ্রের পানিতে নেমে প্রিয়তি ও রূপস্তি খুব আনন্দ করছিল। হঠাৎ সমুদ্রের পানি রূপস্তির মুখে যাওয়ায় সে লক্ষ্য করল সমুদ্রের পানি নোনতা। এর কারণ প্রিয়তিকে জিজেস করায় সে রূপস্তিকে বলল, এটি পানি ও লবণের দ্রবণ। এখান থেকে কিছু নমুনা পানি সংগ্রহ করে প্রিয়তি গ্লাসে রেখে দেয়, এবং পরের দিন দেখে গ্লাসের তলায় কিছু ময়লা জমে আছে। এই নমুনা পানি থেকে প্রিয়তি রূপস্তিকে লবণ তৈরি করে দেখাল।

ক. সম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে?

খ. পানিকে সর্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. সমুদ্র থেকে সংগৃহীত নমুনা পানি কোন ধরণের মিশ্রণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দ্রবণটি থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুটি উপাদান ফিরে পাওয়ার সম্ভব্যতা যাচাই করো।

২. দৃশ্যকল্প-০১: আদিলের জন্য দিনে কোমল পানীয়ের বোতল খোলার সময় সোহেল দেখতে পায় শব্দ করে বায়বীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে।

দৃশ্যকল্প-০২: উষধ খাওয়ানোর সময় আদিল প্রতিবাইঠ লক্ষ্য করে মা উষধের বোতল বাঁকিয়ে নেন। কিন্তু দুধ খাওয়ানোর সময় বাঁকান না।

ক. অসমত্ব মিশ্রণ কাকে বলে?

খ. ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা ৩৬' ব্যাখ্যা করো।

গ. দৃশ্যকল্প-০১ এর দ্রবণটির ধরণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-০২ এর মিশ্রণ দুটি কি একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'তরল দুধ একটি কলয়েড'- ব্যাখ্যা করো।

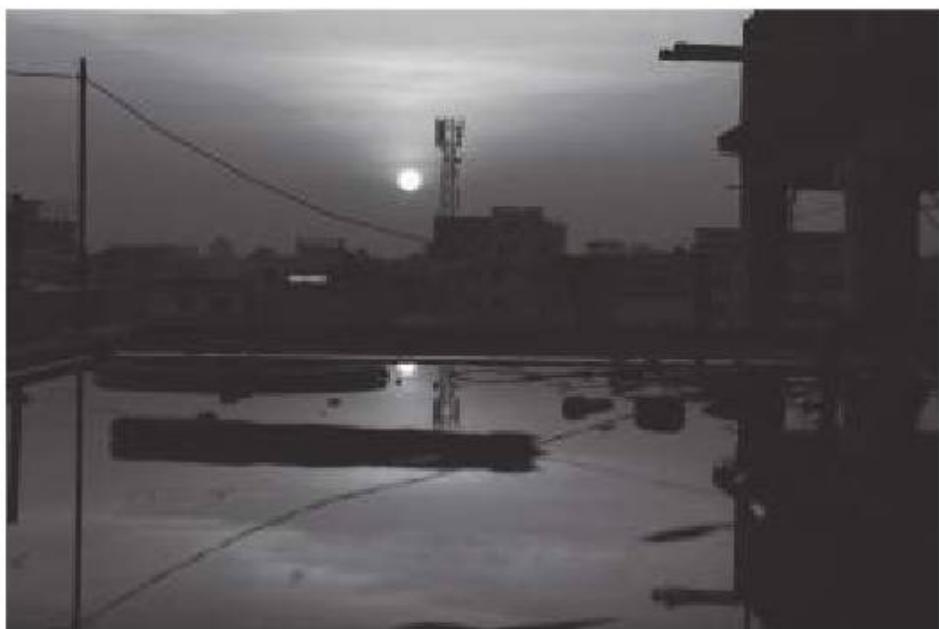
২. 'পানি একটি সর্বজনীন দ্রাবক'- ব্যাখ্যা করো।

৩. কোমল পানীয় কোন ধরনের দ্রবণ? ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায়

আলোর ঘটনা

আলো ছাড়া আমরা দেখতে পাই না। আলো না থাকলে গাছপালা জন্মাত না। প্রাণীরা খাবার পেত না। আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র যেসব জীব থেকে আসে তা জন্মাত না। আলো ছাড়া তাই জীবন কল্পনা করা কঠিন। আলো এক থকার শক্তি। আলোর কাজ করার সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ আলোর আছে শক্তি। কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে ধ্রুয় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই দ্রুতিতে তুমি চলতে পারলে এক সেকেন্ডে তুমি পৃথিবীর চারদিকে সাত বারেরও বেশি ঘূরে আসতে পারতে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আমরা যেখান থেকেই আলো পাই না কেন, সকল আলোর উৎস হলো সূর্য।



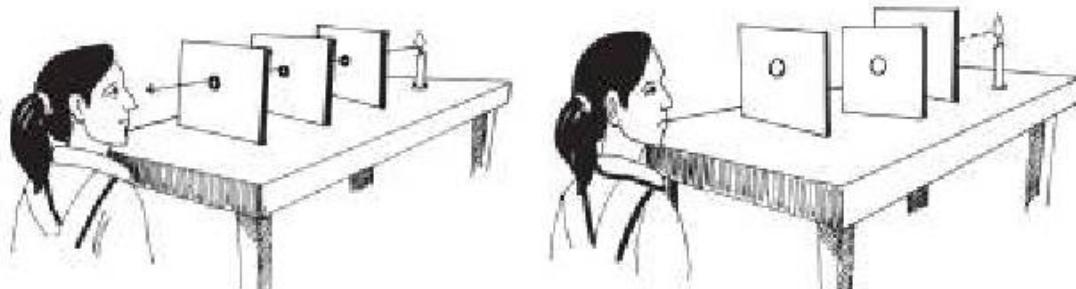
এই অধ্যায় শেষে আমরা

- আলোর সংরক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিফলন ও শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মসৃণ ও অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় আলোর প্রতিফলনের ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-২ : আলো কীভাবে চলে

আমরা জানি যে, আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে থায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এ আলো কীভাবে চলে? সোজা পথে, না বাঁকা পথে? এসো আমরা কিছু কাজ করি। এগুলো থেকে বুঝতে পারব আলো কীভাবে চলে?

কাজ : তোমার নেটুবুকের তিনটি সমান কভার নাও। এদের একটার উপর আরেকটা রাখো, যাতে এদের সকল প্রাণ্ত একসাথে মিলে থাকে। এখন একটি পেরেক বা মোটা সুই দিয়ে তিনটিকে একসাথে ছিদ্র করো। এবার বোর্ড তিনটি টেবিলের উপর এমনভাবে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দাও যেন তিনটি বোর্ডের ছিদ্র একই সরলরেখায় থাকে। এখন একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে বোর্ডগুলোর পেছনে এমনভাবে টেবিলের উপর বসাও যাতে মোমবাতির পুরো শিখাটির উচ্চতা বোর্ডের উচ্চতার সমান হয় (চিত্র ৯.১)। বোর্ডগুলোকে এমনভাবে সাজাও যেন বোর্ডের ছিদ্র ও মোমবাতির শিখা একই সরলরেখায় থাকে। এবার বোর্ডের বিপরীত দিক থেকে মোমবাতির দিকে তাকাও, মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাবে। একটি বোর্ডকে এক পাশে সামান্য সরিয়ে নাও, যাতে তিনটি ছিদ্র একই রেখায় না থাকে। মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাচ্ছ কি? না, এখন আর শিখাটি দেখা যাচ্ছে না। আলো বাঁকা পথে তোমার চোখে প্রবেশ করতে পারেনি। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে? আলো বাঁকা পথে চলে না, সরলরেখায় চলে। আলোর এই সরলরেখিক পথকে আলোকরশ্মি বলে।

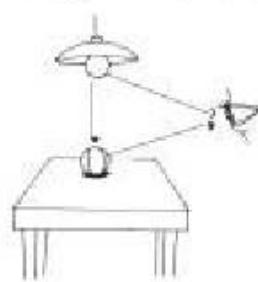


চিত্র ৯.১ : আলো সরলরেখায় চলে

পাঠ-৩ : আমরা কীভাবে দেখি

রাতের বেলা অঙ্ককার ঘরে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই না কেন?

কোনো বস্তুকে আমরা কীভাবে দেখি? আমরা তখনই কোনো বস্তুকে দেখি, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর (চিত্র ৯.২)। এখানে রয়েছে একটি জুলন্ত বাল্ব ও একটি ক্রিকেট বল। বাল্ব থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ছে বলে আমরা বাল্বটি দেখতে পাচ্ছি। বাল্ব থেকে আলো গিয়ে ক্রিকেট বলে পড়ছে, এবং বল থেকে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে, তাই বলটি আমরা দেখছি। আলোর কোন উৎস থেকে সরাসরি আগত অথবা কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিসমূহ যে দিক বরাবর আমাদের চোখে প্রবেশ করে, আমাদের চোখ সেই আলোকরশ্মি যদি চলার সময়ে বেঁকে যায় বা দিক পরিবর্তন করে, এবং তারপর চোখে প্রবেশ করে, তাহলেও এ কথা সত্যি। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে আলোর ঐ উৎস বা ঐ বস্তু যেখানে অবস্থিত সেখানে তাকে না দেখে চোখ তাকে দেখবে অন্য এক স্থানে, অন্য এক দিকে। আরও কিছুটা পর আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। কোনো কোনো বস্তুর নিজের আলো আছে, যেমন, সূর্য, তারা, জোনাকি পোকা, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাল্ব ইত্যাদি। এদের বলা হয় উজ্জ্বল বস্তু। কোনো কোনো বস্তুর নিজের কোনো আলো নেই, অন্য বস্তুর আলো প্রতিফলিত করে, এদের বলা হয় অনুজ্জ্বল বস্তু। চিত্র ৯.২ : আমরা মেভাবে দেখি

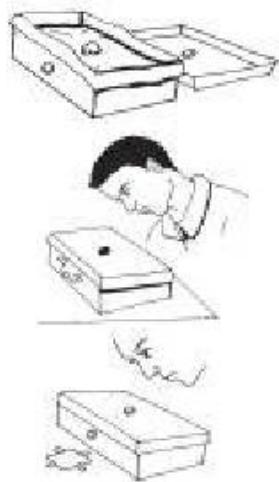


আলো শোষণ করে নেয়। এসব বস্তু তাই দেখতে কালো দেখায়। এটা জানো কি? চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুতে পড়ে না, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

কাজ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি তা জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি কাঠের বাক্স বা জুতার বাক্স, একটি নূড়ি পাথর ও কিছু কালো কাগজ।

পদ্ধতি : ঢাকনাসহ একটি জুতার বাক্স নাও। কালো কাগজ দিয়ে বাক্সের ভিতরটা মুড়ে দাও। ঢাকনার উপর একটি স্কুল ছিদ্র কর এবং একপাশের দেয়ালে একটি বড়ো ছিদ্র করো। নূড়ি পাথরটি ঢাকনার ছিদ্রটির ঠিক নিচে রাখো। ঢাকনাটি বন্ধ করে দাও। বাক্সের পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটি একটি মোটা কালো কাগজ বা টেপ দিয়ে ঢেকে দাও। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে নূড়িটি দেখার চেষ্টা করো। নূড়িটি দেখতে পাচ্ছ কি? না, দেখা যাচ্ছে না। বাক্সের পাশের দেয়ালের বড়ো ছিদ্রটির কালো কাগজ বা টেপ সরিয়ে নাও। এই ছিদ্র দিয়ে বাক্সে আলো প্রবেশ করবে। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে আবার নূড়িটি দেখার চেষ্টা কর। নূড়িটি দেখা যাচ্ছ কি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ৯.৩ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি

এ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে প্রবেশ করলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। অন্ধ লোকেরা দেখতে পান না কেন? কোনো বস্তু থেকে আলো এসে যখন স্বাভাবিক চোখে পড়ে, তখনই বস্তুটি দেখা যায়। অন্ধদের চোখ স্বাভাবিক নয়, তাই বস্তু থেকে আসা আলো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাঁরা দেখতে পান না।

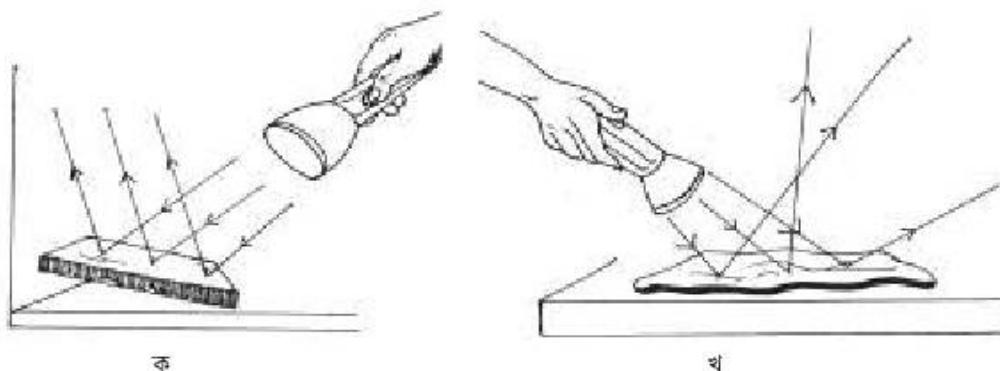
এই পৃষ্ঠায় ছাপা লেখাগুলো আমরা কী করে দেখতে পাই? কালো লেখা বা কোনো কালো বস্তু কোনো উৎস থেকে আসা আলো বেশি শোষণ করে এবং কম প্রতিফলিত করে। কিন্তু সাদা পৃষ্ঠা থেকে আলো প্রতিফলিত হয় বেশি। সেই আলো আমাদের চোখ গ্রহণ করে। ফলে কাগজে ছাপা কালো অনুজ্ঞাগুলো আমরা দেখতে পাই। অনুজ্ঞাল রং উজ্জ্বল রঙের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে। যে বস্তু সকল আলো শোষণ করে তা কালো দেখায়।

পাঠ ৪-৫ : আলোর প্রতিফলন ও শোষণ

কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে সেই ঘটনাকে প্রতিফলন বলে। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে তা হলে বলি যে আলোর শোষণ হয়েছে।

পরবর্তী চিত্র দুটি লক্ষ্য কর, প্রথম চিত্রটিতে মসৃণ তলে (আয়না বা স্টিলের থালা), দ্বিতীয় চিত্রটিতে অমসৃণ তলে আলো পড়েছে (অনেক দিন ব্যবহার করা স্টিলের থালা বা কাগজের পাতা)। দুটি চিত্র কী?

প্রথম চিত্রটিতে দেখা যায় আয়না বা দর্পণ থেকে নিয়মিত প্রতিফলন। এখানে আলো এসে যে কোণে পড়ছে, ঠিক সে কোণেই ফিরে যাচ্ছে। কোনো পৃষ্ঠে আলোর এই পড়া বা পতনকে বলা হয় আপতন এবং পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে ফিরে যাওয়াকে বলা হয় প্রতিফলন। আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল এবং প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলোও পরস্পর সমান্তরাল। দ্বিতীয় চিত্রটিতে আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল নয়। এই ধরনের প্রতিফলনকে বলা হয় অনিয়মিত বা বিস্ফিঙ্গ বা ব্যাঙ্গ প্রতিফলন।



চিত্র ৯.৪ : আলোর প্রতিফলন

কাজ : বিভিন্ন পদার্থে বা পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের ভিজ্ঞাতা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি আয়না বা দর্পণ, এক খণ্ড কাঠ, এক পাতা কাগজ, একটি স্টিলের ও একটি প্লাস্টিকের থালা।

পদ্ধতি : একটি সাদা দেয়ালের উলটা দিকে প্রথমে দর্পণটি খাড়া করে ধরো। এখন টর্চলাইট থেকে আয়নার উপর আলো ফেলো। দর্পণে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়বে। দেয়ালে পড়া এই আলো উজ্জ্বল না অনুজ্জ্বল তা দেয়াল করো। এবার কাগজের পাতা, কাঠখণ্ড, স্টিলের ও প্লাস্টিকের থালার উপর একইভাবে টর্চের আলো ফেলো এবং প্রতিবার দেয়ালে আলোর প্রতিফলন দেখো। কী দেখলে? কোনটিতে প্রতিফলিত আলো বেশি উজ্জ্বল। দেখতে পাবে যে, দর্পণ ও স্টিলের থালা থেকে আলোর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। কাঠের টুকরা, কাগজ ও প্লাস্টিকের থালা থেকে আলোর প্রতিফলন অনেক কম এবং প্রতিফলিত আলো কম উজ্জ্বল।

সুতরাং, যে পৃষ্ঠ যত মসৃণ বা চকচকে তা তত বেশি আলো প্রতিফলিত করে। আর যে পৃষ্ঠ যত অমসৃণ বা কম চকচকে তা তত কম আলো প্রতিফলিত করে। অমসৃণ বা কম চকচকে পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের সাথে অন্য ঘটনাও ঘটে যা তোমরা উপরের শ্রেণিতে শিখবে।

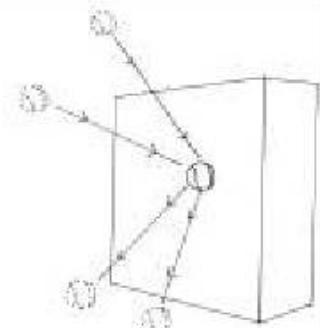
পাঠ ৬-৭ : দর্পণে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম

কোনো দেয়ালে বল ছুঁড়ে মারলে তা দেয়াল থেকে যেভাবে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ঘটনা অনেকটা তার মতো। কোনো বলকে ভূমি যদি সোজাভাবে দেয়ালে ছুঁড়ে দাও, তাহলে তা দেয়ালে লেগে সোজাভাবেই ফিরে আসবে। দর্পণে আলো পড়ার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে। এবার পরের পৃষ্ঠার কাজটি করো।

কাজ : দেয়ালে ছেঁড়া বলের দিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি টেনিস বল।

পদ্ধতি : একটি টেনিস বল নাও। এটাকে লম্বভাবে দেয়ালে হাঁড়ে মারো। দেয়ালে আঘাত করে বলটি কীভাবে ফিরে আসছে? লম্বভাবে না অন্য কোন পথে? এবার বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে হাঁড়ে দাও। বলটি এবার কীভাবে ফিরে আসছে? লম্বভাবে না কোণ করে? বলটিকে দেয়ালের সাথে বিভিন্ন কোণ করে হাঁড়ে দেখ, বলটি কীভাবে ফিরে আসছে।



চিত্র ৯.৫ : বলের দিক পরিবর্তন

এ কাজ থেকে আমরা যা পাই তা হলো-

১. বলটি সোজা হাঁড়লে এটা সোজা ফিরে আসে।
২. বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে হাঁড়লে এটা কোণ করে ফিরে যায়।
৩. বলটিকে যে কোণে ছেঁড়া হয় এটা সে কোণেই ফিরে যায়।

একই রকম ঘটনা ঘটে আলো যখন কোনো দর্পণে আপত্তি ও প্রতিফলিত হয়। নিচের কাজটি করলে এটা বুঝতে সহজ হবে।

কাজ : দর্পণে আলোর প্রতিফলন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি দর্পণ ও একটি টর্চ।

পদ্ধতি : দর্পণটি ঘরের মেঝেতে এমনভাবে রাখ যাতে এর মুখ বা মসৃণ দিকটি উপরের দিকে থাকে। দর্পণে টর্চের আলো সোজা করে ফেলো। টর্চের আলো দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সোজা গিয়ে ছাদে পড়বে। টর্চটি একদিকে সরাও যাতে টর্চের আলো কোণ করে দর্পণে পড়ে। দেখবে কোণ পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাদে পড়া আলো স্থান পরিবর্তন করছে।



চিত্র ৯.৬ : আলোর প্রতিফলন

অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণে আলো পড়ে তাকে বলা হয় আপত্তন কোণ। আর অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণ থেকে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলে প্রতিফলন কোণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আপত্তন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। অর্থাৎ, আপত্তন কোণ = প্রতিফলন কোণ



চিত্র ৯.৭ : আপত্তন ও প্রতিফলন কোণ

পাঠ- ৮ : দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফো

আমরা জানি যে, কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। কিন্তু কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে কোনো মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ঐ পৃষ্ঠে বস্তুটির প্রতিবিষ্ফো সৃষ্টি হয়। কোনো দর্পণ বা আয়না ও স্থির পানি এর পরিচিত উদাহরণ। আমরা যদি কোনো দর্পণের সামনে দাঁড়াই তাহলে আমাদের প্রতিবিষ্ফো দেখতে পাই।

একটি বড়ো দর্পণের (ড্রেসিংটেবিলের আয়না হতে পারে) সামনে দাঁড়াও। দর্পণে তোমার প্রতিবিষ্ফো দেখতে পাবে। এবার বল-

দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফোটি কি তোমার সমান না তোমার চেয়ে বড়ো, না তোমার চেয়ে ছোটো?

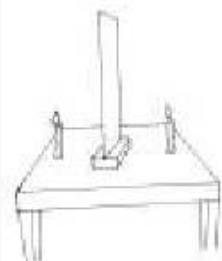
দর্পণের পেছনে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফোর দূরত্ব কি তুমি দর্পণ থেকে যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছ তার সমান? না বেশি বা কম?

- দর্পণের দিকে এক পা এগিয়ে যাও। প্রতিবিষ্ফোটি সমপরিমাণ দূরত্বে সামনে এগিয়ে এসেছে, না পিছিয়ে গেছে? নাকি একই জায়গায় স্থির আছে?
- এবার তোমার ডান হাত নাড়াও। প্রতিবিষ্ফোটি কি হাত নাড়াচ্ছে? নাড়ালে কেন হাত নাড়াচ্ছে, ডান হাত না বাঁ হাত?
- এসব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

কাজ : সমতল দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফোর দূরত্ব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বড়ো স্বচ্ছ কাচ ও দুটি মোমবাতি।

পদ্ধতি : কাচটিকে টেবিলের উপর এমনভাবে সোজা করে দাঁড় করাও যাতে নড়াচড়া না করে। একটি মোমবাতি জুলিয়ে কাচের সামনে টেবিলের উপর রাখো। কাচে জুলন্ত মোমবাতির প্রতিবিষ্ফো দেখতে পাবে। দ্বিতীয় মোমবাতিটি কাচের পেছনে এমনভাবে দাঁড় করাও যাতে জুলন্ত মোমবাতির শিখাটি দ্বিতীয় মোমবাতির শিখার মতো মনে হয়। দেখলে মনে হবে যেন দ্বিতীয় মোমবাতিটি জুলছে। এবার কাচটি থেকে জুলন্ত মোমবাতির দূরত্ব ও দ্বিতীয় মোমবাতির দূরত্ব মাপো। দেখ দুটি দূরত্ব সমান কি না? মজার ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় মোমবাতির জায়গায় তুমি যদি তোমার হাতের আঙুলটি ধরো তাহলে মনে হবে তোমার আঙুলটি জুলছে।



চিত্র ১.৮ : প্রতিবিষ্ফোটি গঠন

এপাঠে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার উত্তর হলো-

- ক. দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফোটি তোমার সমান আকৃতির। সকল বস্তুর বেলায় এটা সত্য।
- খ. দর্পণ থেকে তোমার দূরত্ব ও প্রতিবিষ্ফোর দূরত্ব সমান।
- গ. প্রতিবিষ্ফোটি পরিবর্তন করে অর্থাৎ ডান ও বাঁ দিক তাদের অবস্থান বিনিময় করে। তুমি ডান হাত নাড়ালে প্রতিবিষ্ফোটি বাঁ হাত নাড়াচ্ছে বলে মনে হবে।

পাঠ ৯-১০ : কিছু আলোকীয় ঘটনা

দর্পণে প্রতিফলন: বস্তুর একটি বিন্দু O থেকে একটি সমতল দর্পণ MM' এর সামনে থাকে তখন আমাদের স্বাভাবিক চোখে তার দুটি প্রতিবিষ্ফো তৈরি হয়। একটি প্রতিবিষ্ফোটি বিন্দুটির প্রকৃত অবস্থানে তৈরি হয়, অন্যটি হয় দর্পণের পেছনে। অবস্থানে। দেখা যাক এই দ্বিতীয় প্রতিবিষ্ফোটি কীভাবে তৈরি হয়।

O থেকে আপত্তি অনেক রশ্মির মধ্যে দুটি রশ্মি OA এবং OB ছবিতে দেখানো হয়েছে। দর্পণে প্রতি লনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলনের পর এরা AC এবং BD পথে অগ্রসর হয়ে চোখে প্রবেশ করে। তার্থাত চোখ দেখতে পায় দুটি রশ্মি AC এবং BD, যারা I বিন্দু থেকে আগত বলে প্রতীয়মান হয়। তাই চোখ I বিন্দুতে O- এর একটি বিষ্ণ দেখতে পায়।

পেরিস্কোপে প্রতিফলন: পেরিস্কোপ তৈরি হয় একটি লম্বা টিউব এবং দুটি স্ফুর্দ্ধ সমতল দর্পণ দিয়ে। টিউবের দুই প্রান্তে দর্পণ দুটিকে টিউবের দেয়ালের সাথে 85° কোণে স্থাপন করা হয়, ছবিতে ঘেমন দেখানো আছে। দর্পণগুলো পরস্পর সমান্তরাল থাকে।

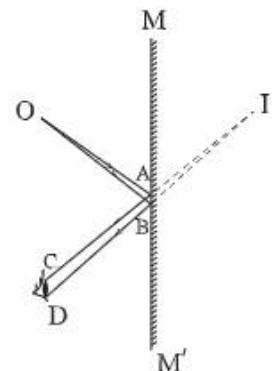
ছবিতে দেখানো একটি বস্তুর একটি বিন্দু O থেকে আলোকরশ্মি এসে পেরিস্কোপের A প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে প্রথম দর্পণ M-এ আপত্তি হয়, এবং সেখানে প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় দর্পণ N-এ আপত্তি হয়। দ্বিতীয় দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে সেই রশ্মি পেরিস্কোপের B প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। সেখানে আমাদের চোখে যদি এই রশ্মি আপত্তি হয় তাহলে চোখ দেখে যে NB বরাবর আলো আসছে, সুতরাং O বিন্দুর একটি বিষ্ণ চোখ দেখতে পায় এই রেখা বরাবর I বিন্দুতে।

চোখের সামনে যদি কোনো বাধা থাকে (ছবিতে PQ), তাহলে বাধার অন্য পাশের বস্তু বা ঘটনা দেখার জন্য তানেক সময় পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। স্টেডিয়ামে ভীড়ের মধ্যে খেলা দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে কী আছে তা ডুবোজাহাজ থেকে দেখার জন্যও এর ব্যবহার বেশ প্রচলিত।

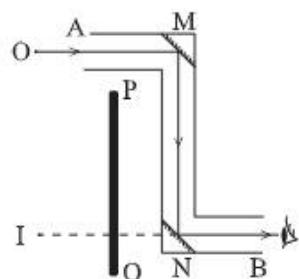
নতুন শব্দ: দর্পণ, সমতল দর্পণ, প্রতিফলন, শোষণ, নিয়মিত প্রতিফলন, বিক্ষিণ্ণ প্রতিফলন, প্রতিবিষ্ম, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।
- আলো সরলরেখায় চলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তাহলে তাকে প্রতিফলন বলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে, তাহলে তাকে শোষণ বলে।
- আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।
- সকল পৃষ্ঠ থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়।
- মসৃণ ও পালিশ করা পৃষ্ঠ থেকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
- দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ম বস্তুর সমান আকৃতির হয়।
- সমতল দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্মের পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।
- দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিষ্মের দূরত্ব সমান।



চিত্র ৯.৯ : আলোকীয় ঘটনা



চিত্র ৯.১০ : পেরিস্কোপ

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা ফিরে না আসে তাহলে তাকে কী বলে?

ক. শোষণ

খ. প্রতিফলন

গ. প্রতিসরণ

ঘ. বিশ্লেষণ

২. কোনো বস্তু আমরা দেখতে পাই যখন-

ক. বস্তুটি আলো শোষণ করে

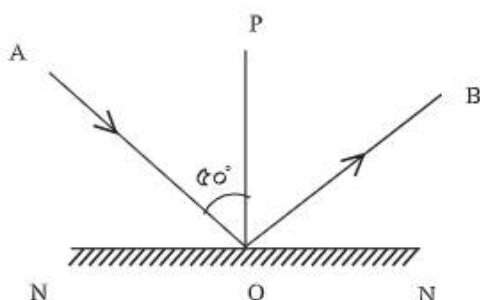
খ. বস্তুটি আলো প্রতিফলিত করে

গ. বস্তুটি আলো প্রতিসরিত করে

ঘ. চোখ থেকে আলো বস্তুতে পড়ে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

উদ্দীপক:



৩. $\angle BON$ এর মান কত?

ক. 10°

খ. 80°

গ. 50°

ঘ. 90°

৪. রশ্মিটি অভিলম্ব বরাবর আপত্তি হলে প্রতিফলন কোণের মান কত হবে?

ক. 0°

খ. 80°

গ. 50°

ঘ. 90°

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সামিন ছুলের ব্যবহারিক ক্লাসে পেরিকোপ নিয়ে এর মধ্যে তাকাতেই ক্লাসের বাইরে অবস্থিত বাগানের ফুল দেখতে পেল। ক্লাসের শেষে হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের আয়নার সামনে যেতেই লক্ষ করল সে যত সামনে আসছে আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও তত সামনে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে যাওয়ার সময় আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর বাসায় ফিরে সে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ৩০° কোণে দর্পণ ছাপন করে একটি পেরিষ্কোপ তৈরি করল।

ক. আলোর প্রতিফলন কাকে বলে?

খ. মাটি ও দর্পণ পৃষ্ঠাতলের মধ্যে কোনটিতে বেশি আলো প্রতিফলিত হবে? ব্যাখ্যা করো।

গ. আয়নার সামনের প্রতিচ্ছবি পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সামনের বাসায় প্রস্তুতকৃত পেরিকোপ দিয়ে ছুলের অনুরূপ বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে কি? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। দুটি সমতল দর্পণ সমকোণে মিলিত হয়েছে। একটি আলোক রশ্মি ২০° কোণে প্রথম দর্পণে পড়েছে।

ক. প্রতিফলন কাকে বলে?

খ. কোন বস্তু দেখার জন্য আলোর কোন ঘটনা অপরিহার্য? ব্যাখ্যা করো।

গ. দ্বিতীয় দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি অংকন করে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সমান্তরাল করা হলে কোন ধরনের প্রতিফলন ঘটবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পেরিকোপে দুটি সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

২। প্রতিফলনের দুটি নিয়ম লেখো।

৩। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

গতি

স্থিতি ও গতি আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ বিশে কোনো বস্তু স্থির আবার কোনো বস্তু গতিশীল। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে নানা রকম স্থিতি ও গতি দেখতে পাই। বাড়িগুল, দালান-কোঠা, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, রাস্তার পাশে গাছ সব সময়ই দাঁড়িয়ে আছে—এরা স্থিতিতে আছে বা স্থির। চলমান বাস, চলন্ত গাড়ি, চলন্ত রিক্তা, চলন্ত ট্রেন এমনকি আমাদেরও হাঁটা-চলা হলো গতির উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- স্থিতি ও গতির পার্থক্য করতে পারব।
- সকল গতিই আপেক্ষিক তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার গতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- দূরত্ব ও দ্রুতি নির্ণয় করতে পারব।
- দ্রুতি পরিমাপে স্টপ-ওয়াচ (থামা-ঘড়ি) সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারব।
- অতিরিক্ত গতি কীভাবে জীবনের জন্য বুঁকি বয়ে আনে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরকে সচেতন করব।

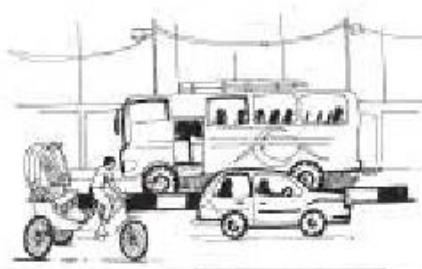
পাঠ-১ : স্থিতি ও গতি

আমাদের চারপাশে নানা রকম বস্তু রয়েছে। এদের অনেকে স্থির রয়েছে, অর্থাৎ স্থিতিতে রয়েছে, যেমন : ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছ, রাস্তার পাশের ল্যাম্প-পোস্ট ইত্যাদি। এরা এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।



চিত্র ১০.১ : স্থির অবস্থা

আবার অনেক বস্তু আছে যা চলমান বা এদের গতি আছে। যেমন : চলমান ট্রেন, চলন্ত বাস ও গাড়ি, চলমান সাইকেল ও রিকশা, হেঁটে চলা লোক ইত্যাদি।



চিত্র ১০.২ : গতিশীল অবস্থা

এবার আসা যাক আমরা স্থিতি ও গতি বলতে কী বুঝি? মনে কর, আনুশেহ রাস্তার এক পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আনুশেহ বলছে, রাস্তার পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ও বাসস্টপ সবই স্থির রয়েছে। সে কেন এ কথা বলছে? বলতে পারবে?

আনুশেহ এ কথা বলছে কারণ এসব বস্তু তার সাপেক্ষে সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে না। তাই কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে তা হলে তা স্থির এবং বস্তুর ঐ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।

কাজ : হাত দিয়ে একটি কলম ধরে রাখো। তোমার আশেপাশের বস্তুগুলোর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তুলনা করো।

তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশেপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন : তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা ও ঘরের সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। কলমের আশেপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমটির অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি, পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাই হচ্ছে স্থিতি। সুতরাং, সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন না করা হলো স্থিতি। এবার আরেকটি ঘটনা ধরা যাক। আরিয়ান একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করে চলে গেল। তা দেখে সে বলল যে, ট্রেনটি গতিশীল। কারণ তার সাপেক্ষে ট্রেনটির অবস্থান প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আরিয়ানের সাপেক্ষে ট্রেনটি প্রতিক্রিয়া অবস্থান পরিবর্তন করছে।

কাজ : তোমার হাতে ধরা কলমটিকে এদিক-সেদিক নাড়তে থাকো। আশেপাশের সকল বস্তুর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা তুলনা করো।

কলমের আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব ও দিক ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল। সুতরাং, কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক গতির উদাহরণ হলো, চলমান বাস, কোনো ব্যক্তির দৌড়ে চলা, পাথি উড়ে যাওয়া, ফুটবল গাড়িয়ে যাওয়া, গাছ থেকে ফল পড়া ইত্যাদি। তোমরাও এরকম গতির অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। বল তো এরকম আর কী কী বস্তুর গতি আছে?

পাঠ-২ : স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক

কোনো বস্তু এক পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকলেও একই সঙ্গে অন্য পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হতে পারে। একটি ঘটনা বিবেচনা করা যাক, আরিয়ান বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে বসে থাকা একজন যাত্রী বাসের গতিতে তাকে অতিক্রম করে গেল। আরিয়ানের তুলনায় বা সাপেক্ষে বাস ও বাসের যাত্রী গতিশীল। কিন্তু বাসস্টপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি তার সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু বাসের যাত্রীর নিকট মনে হচ্ছে যে গাছটি তার সাপেক্ষে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ বাসস্টপের গাছটি বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। আরিয়ান যদি এই বাসের যাত্রী হতো তাহলে সে দেখতে পেত যে তার সাপেক্ষে এই যাত্রীটি ছির, কিন্তু বাসস্টপের গাছটি তার সাপেক্ষে পিছনের দিকে গতিশীল। একই গাছ আরিয়ানের সাপেক্ষে ছির কিন্তু বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই পরম স্থিতি বা পরম গতিতে থাকতে পারে না। স্থিতি বা গতি কথা দুটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে কে পর্যবেক্ষক তার উপর। কোনো বস্তু কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় গতিশীল হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের তুলনায় ছির থাকতে পারে। সুতরাং স্থিতি বা গতি পরিমাপের আগে ঠিক করে নিতে হবে কার সাপেক্ষে স্থিতি বা গতি পরিমাপ করা হবে।

কাজ : একটি সাইকেল নিয়ে তিন বন্ধু মাঠে যাও। এক বন্ধুকে এক জায়গায় ছির হয়ে দাঁড়াতে বলো। তুমি সাইকেলের পেছনের সিটে বস এবং অপর বন্ধুকে সাইকেলটি সোজা চালাতে বলো। তোমরা সাইকেলে ঢ়ো দুই বন্ধু ছির বন্ধুর সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়া অবস্থান পরিবর্তন করছ।

ছির বন্ধুর সাপেক্ষে তোমরা কি গতিশীল? হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পাশে বসে সাইকেল চালানো বন্ধুটি কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল? অবশ্যই নয়। সুতরাং সকল গতিই আপেক্ষিক।

প্রসঙ্গ-কাঠামো

যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতি বা স্থিতি পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ-কাঠামো। সুতরাং, প্রসঙ্গ-কাঠামো হলো এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দু, যার সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়। প্রসঙ্গ-কাঠামো হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো বস্তু, যে কোনো স্থান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তুমি যদি তোমার বাড়ির সাপেক্ষে একটা রিক্লার গতিবেগ মাপতে চাও, এক্ষেত্রে তোমার বাড়ি হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো। পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের বেগ জানতে চাইলে পৃথিবী হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো।

আমরা জানি, সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিশীল। মনে কর, তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি অবশ্যই বলবে যে, তুমি ভূমির সাপেক্ষে ছির আছ বা স্থিতিতে আছ। কিন্তু পৃথিবী নিজেই তার অক্ষের চারদিকে ঘূরছে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।

পাঠ ৩-৪ : নানা প্রকার গতি

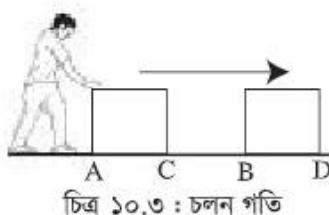
গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। যেমন :

(ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি

চলন গতি

মনে কর, একটা বাক্স AC-কে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাক্সের A বিন্দু B বিন্দুতে সরে গেছে এবং C বিন্দু চলে গেছে D বিন্দুর উপর।

এর সকল বিন্দু একই মাপ বরাবর একই দূরত্ব CD পরিমাণ সরে গেছে। এটি হলো চলন গতির উদাহরণ।

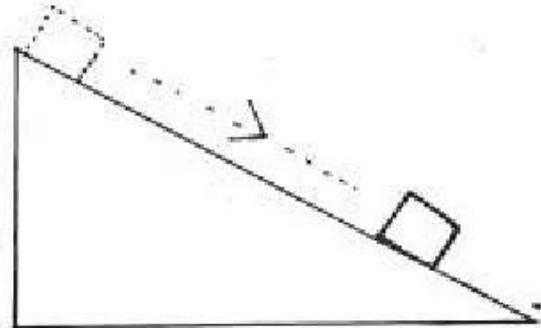


চিত্র ১০.৩ : চলন গতি

সুতরাং, চলন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

কাজ : একটি ইট সংগ্রহ করো। তোমাদের শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ইটটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A তে রাখো। চক দিয়ে দাগ দিয়ে ইটের সামনের ও পিছনের প্রান্ত টেবিলের উপর চিহ্নিত করো। এখন বস্তুটিকে সামনের দিকে ঠেলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাও। এবার টেবিলে চিহ্নিত ইটের সামনের প্রান্ত থেকে ইটের নতুন অবস্থানের সামনের প্রান্ত এবং শেষ প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেকোনো দূরত্ব সমান। এরকম মধ্যবিন্দু থেকে মধ্যবিন্দু মাপলে দূরত্ব একই পারে।

টেবিলের ড্রয়ারের গতি, ঢালু তল দিয়ে কোনো বাক্স পিছলে পড়ার গতি, লেখার সময় হাতের গতি-এগুলো সবই চলন গতি। চলন গতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) সরল গতি ও (২) বক্র গতি। যখন আমরা লিখি, তখন আমাদের হাত কখনো সোজা বা সরলরেখায় অগ্রসর হয় আবার কখনো বক্ররেখায় অগ্রসর হয়।



চিত্র ১০.৪ : সরলগতি

যখন কোনো বস্তু সরলরেখায় বরাবর চলে, তখন একে সরল রৈখিক গতি বলে। আবার কোনো বস্তু যখন বক্রপথে চলে তখন এর গতি হয় বক্রগতি।

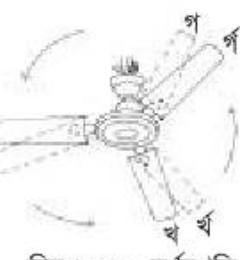


চিত্র ১০.৫ : বক্রগতি

কাজ : কোনো বন্ধুকে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সোজা হেঁটে যেতে বলো। এটা হলো সরল রৈখিক গতি। আরেক বন্ধুকে আঁকাবাঁকা পথে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে বলো। এটা হলো বক্রগতি।

পাঠ-৫ : ঘূর্ণনগতি

তোমার শ্রেণিকক্ষের সিলিং ফ্যানের গতি লক্ষ করো। চিত্রটি দেখ, এখানে ঘূর্ণযামান বৈদ্যুতিক পাখার ব্রেডের ঘূর্ণনের ফলে ক বিন্দু ক বিন্দুতে, খ বিন্দু ক বিন্দুতে এবং গ বিন্দু গ বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাখার প্রতিটি বিন্দু ক পাখার কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলেছে। পাখার এই গতিই হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে ঘূর্ণনগতি পর্যবেক্ষণ করো।



চিত্র ১০.৬ : ঘূর্ণনগতি

কাজ : ক্রলের মাঠে যাও। বাঁশের খুঁটিটি শক্ত করে মাটিতে পৌঁত। এক হাত দিয়ে বাঁশটি শক্ত করে ধরে ধরে বাঁশের চারদিকে ঘূরতে থাকো। এই গতি হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ।



করো।

চিত্র ১০.৭ : ঘূর্ণনগতি

পাঠ-৬ : ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিলগতি

তোমরা সাইকেলের চাকার গতি লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। সাইকেলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় বা পথ চলে। এই গতির যেমন ঘূর্ণন আছে তেমন চলন আছে। এই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিলগতি বলে। গড়িয়ে যাওয়া বলের গতি, ড্রিল মেশিনের গতি হল ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

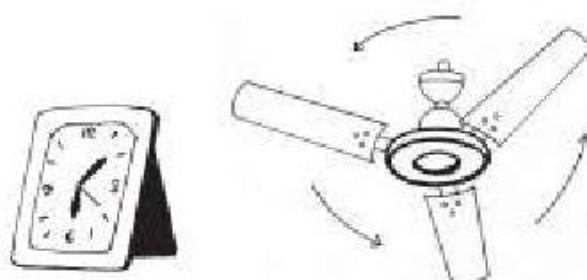
কাজ : স্কুলের মাঠে কোনো বন্ধুকে সাইকেল চালাতে বলো। সাইকেল চলার সময় এর চাকার গতি লক্ষ্য করো।

চাকা দুটি কী করছে? ঘুরছে। চাকা কিসের চারদিকে ঘুরছে? চাকা কোনো দূরত্ব অতিক্রম করছে কি? চাকা দুটি এদের কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং প্রতিবারই কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে ঘূর্ণন গতি ও চলন গতি একসাথে কাজ করে। এই গতি ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

পাঠ-৭ : পর্যাবৃত্ত গতি

ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ্য করো। সেকেন্ডের কাঁটাটি প্রতি এক মিনিটে একবার এর কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে ঘুরে আসে। কাঁটাটি বারবার একটি পথে একই বেগে ঘুরছে অর্থাৎ এর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ধরনের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি।

তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ের কথা মনে করো। মনে করো, তুমি মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছো। চারপাক দৌড়ের একজন প্রতিযোগী তোমাকে একই দিক থেকে চারবার অতিক্রম করে যাবে। এটাও পর্যাবৃত্ত গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি, পাকদৌড়ের গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি। সুতরাং, কোনো গতিশীল বস্ত যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।

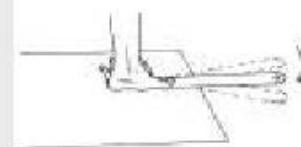


চিত্র ১০.৮ : পর্যাবৃত্ত গতি

কাজ: ভালো করে ফোলানো একটা ফুটবলকে প্রথমে উল্লম্ব বরাবর মেঝের দিকে ছুঁড়ে দাও সোজা নিচের দিকে। বলটি যখন মেঝেতে থাকা থেয়ে ওপরের দিকে ফিরে আসবে তখন আবারো তাকে নিচে ঠেলে দাও বারবার এটা করতে থাকো। এ ক্ষেত্রে বলের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি কারণ এর গতির একটা অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তুমি যখন বলটাকে বারবার হাত দিয়ে নীচে ঠেলে দিচ্ছো তখন তোমার হাতের গতিও পর্যাবৃত্ত। এবার তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দাও।

পার্ট-৮ : দোলন বা স্পন্দন গতি

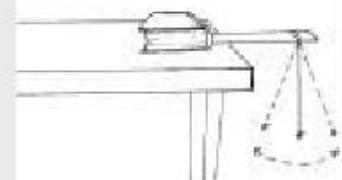
কাজ : একটি প্লাস্টিকের রুলার নিয়ে একে টেবিলের এক পাশে এমনভাবে রাখ, যাতে এর বেশ কিছুটা অংশ (প্রায় অর্ধেক) টেবিলের বাইরে থাকে। এবার এক হাত দিয়ে টেবিলের উপরের রুলারের অংশটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধর। যাতে এটি নড়ে চড়ে না যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে ছির থাকে। অপর হাত দিয়ে রুলারটির টেবিলের বাইরের অংশটি নিচের দিকে টেনে সামান্য নামিয়ে ছেড়ে দাও।



চিত্র ১০.৯ : দোলন গতি

তুমি কী দেখছ? টেবিলের বাইরের রুলারের অংশটি উপরে নিচে উঠানামা করছে (চিত্র ১০.৯) এই ধরনের গতিকে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে।

কাজ : সুতার এক প্রান্তে ছোটো নুড়ি পাথরটিকে বেঁধে ছবির মতো করে টেবিলের এক প্রান্তে ঝুলিয়ে দাও। নুড়ি পাথরটিকে এক পাশে টেনে সামান্য দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও। পাথরটি প্রথমে যে ছির অবস্থান থেকে টেনে নেয়া হয়েছিল, সে অবস্থানে ফিরে আসবে। এরপর পাথরটি আবার ছির অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে যাবে। কিছু দূরে যাবার পর আবার ছির অবস্থানে ফিরে এসে যে দিকে টানা হয়েছিল সেদিকে যাবে। এভাবে পাথরটি এর ছির অবস্থানের দুই দিকে দুলতে থাকবে। এই দোলন হলো পাথরের ছির অবস্থানের দুই পাশে অগ্রপঞ্চাঙ্গ গতি (চিত্র ১০.১০)। পাথরের এই গতিকে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে।



চিত্র ১০.১০ : স্পন্দন গতি

সুতরাং, দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সেই পর্যাবৃত্ত গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের দুই পাশে সমান ভাবে চলে বা গতিশীল। দেয়ালঘড়ির দোলকের গতি দোলন গতি।

পার্ট-৯ : দূরত্ব ও সরণ

মনে কর, আনিলা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ১০ মিটার দক্ষিণে গেল। তারপর সে উল্টা দিকে যুরে উত্তর দিকে ৪ মিটার গেল। এখানে আনিলা দূরত্ব অতিক্রম করল ($10+4$) মিটার বা ১৪ মিটার। কিন্তু আনিলার সরণ ঘটল মাত্র ($10-4$) মিটার = ৬ মিটার।



চিত্র ১০.১১ : সরণ ও দূরত্ব

কেন? কারণ,

দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা মোট দৈর্ঘ্য। এখানে তা ১৪ মিটার। আর সরণ হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করা সোজাসুজি দূরত্ব। যা হলো (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার।

সুতরাং, দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে সোজাসোজি বা সরলরেখায় অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ হলো বস্তুটির প্রথম অবস্থান থেকে বস্তুটির শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।

উদাহরণ : মিসেস রাশিদা সামনের দিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটলেন। এরপর বাঁক নিয়ে পেছনের দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

$$\begin{aligned} \text{মিসেস রাশিদার অতিক্রান্ত দূরত্ব} &= \text{মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব} \\ &= 7 \text{ কিলোমিটার} + 5 \text{ কিলোমিটার} \\ &= 12 \text{ কিলোমিটার} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{মিসেস রাশিদার সরণ} &= \text{সোজাপথে প্রথম থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব} \\ &= 7 \text{ কিলোমিটার} - 5 \text{ কিলোমিটার} = 2 \text{ কিলোমিটার} \end{aligned}$$

চিত্র ১০.১২ : সরণ ও দূরত্ব

সমাধান কর

রাশেদ সাহেব সকাল বেলা উভর দিকে ৪ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন। অতঃপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ৭ কিলোমিটার এলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

পাঠ-১০ : দ্রুতি ও বেগ

মনে কর, স্কুল ছুটির পর আনিলা ও নওশীন নভোথিয়েটারে গেল। দুজনেই বিকাল ৫টায় রওনা করল, আনিলা নভোথিয়েটারে পৌছাল ৫টা ৩০ মিনিটে আর নওশীন পৌছাল ৫টা ১০ মিনিটে। কে বেশি দ্রুত গেল? অবশ্যই নওশীন। কারণ নওশীন সমপরিমাণ দূরত্ব আনিলার চেয়ে ২০ মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেছে।

রবিন ও শাহীন তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা করল। রবিন স্কুলে পৌছাল ২০ মিনিটে, শাহীন পৌছাল ৪০ মিনিটে। রবিনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৬০০ মিটার এবং শাহীনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২০০০ মিটার। কে বেশি দ্রুত গেল? এখানে রবিন কম দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং শাহীন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

কে বেশি দ্রুত গেল তা বের করতে আমাদের বের করতে হবে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। মনে করা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় হলো ১ মিনিট।

$$1 \text{ মিনিটে } \text{রবিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = 1600/20 = 80 \text{ মিটার।}$$

$$1 \text{ মিনিটে } \text{শাহীনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = 2000/80 = 50 \text{ মিটার।}$$

সুতরাং, রবিন বেশি দ্রুত স্কুলে গেল। কারণ, সে ১ মিনিটে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এটাকে এভাবেও বলা যায়,

দ্রুতি = দূরত্ব / দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়

দূরত্ব মাপা হয় মিটারে, একে সংক্ষেপে 'মি' দিয়ে বুঝানো হয়, সময় মাপা হয় সেকেন্ডে, একে সংক্ষেপে বুঝানো হয় সে. দিয়ে।

উদাহরণ : একটি গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। এর দ্রুতি কত?

$$\begin{aligned}\text{দ্রুতি} &= \text{দূরত্ব} / \text{দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়} \\ &= ৬০ \text{ মি.}/\text{৩সে.} \\ &= ২০ \text{ মি.}/\text{সে.}\end{aligned}$$

সমাধান কর : নাহিয়ান কলেজের ঢাঈড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ে ৫০০০ মিটার ২৫ মিনিটে গেল। তার দ্রুতি কত?

বেগ

কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।

মনে কর লুবাবা উভর দিকে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার গেল। তার বেগ কত হবে?

$$\begin{aligned}\text{বেগ} &= ১৫ \text{ মিটার}/\text{১০ সেকেন্ড} \\ &= ১.৫ \text{ মি.সে.উভর দিকে}\end{aligned}$$

বেগের মান বলার সাথে দিকও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, বেগের মান ও দিক উভয়ই আছে। কিন্তু দ্রুতির শুধু মান আছে। স্কুলের ঢাঈড়া প্রতিযোগিতার পাকদৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো দ্রুতির উদাহরণ। এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু মান আছে। নির্দিষ্ট কোনো দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো বেগের উদাহরণ।

মনে রেখ

- কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোনো বস্তুর সরণ হলো ঐ বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের সমান।
- সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

পাঠ- ১১ : ত্বরণ

মনে কর, একটি মোটর সাইকেল ২০ মিটার/সেকেন্ড বেগে চলছিল। চালক অ্যাকসিলারেটর চাপলেন ফলে মোটরসাইকেলটি আরও বেশি বেগে যেতে লাগল। মনে করা যাক, প্রতি সেকেন্ডে মোটরসাইকেলের বেগ ৫ মিটার/সেকেন্ড বাঢ়ছে।

মোটরসাইকেলটির আদি বা প্রাথমিক বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড

- ১ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ২৫ মিটার/সেকেন্ড
- ২ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩০ মিটার/সেকেন্ড
- ৩ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩৫ মিটার/সেকেন্ড
- ৪ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪০ মিটার/সেকেন্ড
- ৫ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪৫ মিটার/সেকেন্ড

প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বেগ বাঢ়ছে তা হলো ত্বরণ। এখানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড বেগ বাঢ়ছে।

সুতরাং ত্বরণ হলো প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড। একে ৫ মিটার/সেকেন্ড^২ লেখা হয়। মোট সময় এবং ঐ সময়ে বেগের মোট বৃদ্ধি জানা থাকলে সহজেই ত্বরণ বের করা যায়।

এখানে আদি বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড। শেষ বেগ ছিল ৪৫ মিটার/সেকেন্ড

সুতরাং বেগের মোট বৃদ্ধি ($45 - 20$) মিটার/সেকেন্ড = 25 মিটার/সেকেন্ড

মোট সময় লেগেছে 5 সেকেন্ড

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং, ত্বরণ} &= (\text{বেগের মোট বৃদ্ধি})/(\text{মোট সময়}) \\ &= (25\text{মি}/\text{সে})/5\text{সে}^2 = 5 \text{ মি}/\text{সে}^2\end{aligned}$$

সুতরাং, ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি একক সময়ে বেগের বৃদ্ধি।

মন্দন

উপরের উদাহরণে মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে 5 মি/সে বাঢ়ছিল। চালক যদি অ্যাকসিলারেটর না চেপে ব্রেক চাপতেন তাহলে মোটরসাইকেলটি ধীরগতি হয়ে যেত। এর বেগ হয়ত প্রতি সেকেন্ডে 5 মি/সে কমতে থাকত। মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কমত তাকে বলা হয় খাগাতুক ত্বরণ বা মন্দন।

পাঠ -১২ : অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি

কাজ : $5/6$ জন বন্ধু মিলে এক একটি দল তৈরি করো। প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে যানবাহনের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা করো। আলোচনা শেষে কারণগুলো খাতায় লেখো। প্রতিটি দল থেকে একজন তা উপস্থাপন করো। সকল দলের উপস্থাপনের পর নিজেরা সারসংক্ষেপ তৈরি করো।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ দুর্ঘটনার একটি কারণ অতিদ্রুত গাড়ি চালানো। অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে যানবাহনের উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সুতরাং, যেসব বাসচালক, ট্রাকচালক বা গাড়িচালক অতিদ্রুত গাড়ি চালান, তারাই বেশি দুর্ঘটনায় পড়েন। ফলে অনেক লোক মারা যায়। অনেক লোক আহত হয়। অনেক লোক চিরজীবনের জন্য পঁচু হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত বেগে বাস, ট্রাক, লরি ও গাড়ি চালাতে নেই। কেউ চালালেও তাকে নিষেধ করতে হবে। সরু রাস্তা, রাস্তার বাঁক ও সেতুতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি। এসব জায়গায় অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক রাস্তায় যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। এ নির্দিষ্ট গতিসীমা মেলে যানবাহন চালাতে হবে। বড় হয়ে নিজেরা কখনো অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালাবে না এবং অন্যকেও চালাতে নিষেধ করবে।

নতুন শব্দ : স্থিতি, গতি, চলন গতি, ঘূর্ণন গতি, পর্যাবৃত্ত গতি, স্পন্দন গতি, সরণ, বেগ ও ত্বরণ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি।
- কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে, তখন বস্তুটিকে স্থিতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।
- সকল গতিই আপেক্ষিক।
- গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। যেমন (ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি
- কোনো গতিশীল বস্তুর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে চলন গতি বলে।
- কোনো বস্তুর সকল বিন্দু একই পথে না চলে এর প্রতিটি বিন্দু যদি এর কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্দের বৃত্তাকার পথে চলে তাহলে এর গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে।

- যে গতির ঘূর্ণন ও চলন উভয়ই আছে সেই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বলে।
- কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বাইবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।
- দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অগ্রপঞ্চাং চলন বা গতিশীল।
- দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
- কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
- ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।
- মন্দন হলো ঝণাঝাক ত্বরণ।
- যানবাহনের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?

ক. দ্রুতি

খ. বেগ

গ. দূরত্ব

ঘ. ত্বরণ

২. ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার গতি কোন ধরনের গতি?

ক. চলন গতি

খ. ঘূর্ণন চলন গতি

গ. দোলন গতি

ঘ. পর্যাবৃত্ত গতি

নিচের উদ্ধীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিমি একটি স্থান থেকে নির্দিষ্ট দিকে সোজাপথে ৮ মিটার গেল। সেখান থেকে একই পথে বিপরীত দিকে ৬ মিটার ফিরে এলো।

৩. রিমি কত দূরত্ব অতিক্রম করল?

ক. ২ মিটার

খ. ১০ মিটার

গ. ১৪ মিটার

ঘ. ৪৮ মিটার

৪. রিমির সরণ কত?

ক. ২ মিটার

খ. ৬ মিটার

গ. ৮ মিটার

ঘ. ১৪ মিটার

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ফাতিমা, খাদিজা ও আয়েশা বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা হলো। স্কুলে পৌছাতে ফাতিমার ১৫ মিনিট, খাদিজার ২০ মিনিট এবং আয়েশার ৩০ মিনিট সময় লাগল। ফাতিমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫০০ মিটার, খাদিজার ১৮০০ মিটার এবং আয়েশার ২১০০ মিটার।

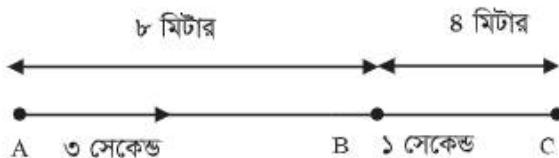
ক. পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে?

খ. দেয়াল ঘড়ির দোলকের গতি কী ধরনের গতি? ব্যাখ্যা করো।

গ. খুশবুর দ্রুতি নির্ণয় করো।

ঘ. খাদিজার ও আয়েশার দ্রুতির তুলনা করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে একটি কণা A বিন্দু থেকে C বিন্দুর দিকে যাচ্ছে।

ক. স্থিতি কাকে বলে?

খ. প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. A বিন্দু থেকে C বিন্দু পর্যন্ত যেতে কণাটির গড় বেগ নির্ণয় করো।

ঘ. AB ও BC অংশে বেগের পার্থক্য নির্ণয় করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের গতি কোন ধরনের গতি? ব্যাখ্যা করো।

২. 'সাইকেলের চাকার গতি একটি জটিল গতি' - ব্যাখ্যা করো।

৩. দ্রুতি ও বেগের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখো?

একাদশ অধ্যায়

বল ও সরল যন্ত্র

কোন বস্তুর গতি অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে যে প্রভাব প্রয়োগ করতে হয় তাকে বলা হয় বল। বল প্রয়োগে স্থিতিশীল বস্তু গতিশীল হয়, গতিশীল বস্তুর বেগ পরিবর্তিত হয়, কিংবা গতিশীল বস্তু স্থিতিশীল হয়। বলের আছে বিভিন্ন রূপ। বল প্রয়োগেরও আছে বিভিন্ন কৌশল। এইসব কৌশলে বল প্রয়োগ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব, এবং কাজকে সহজ করাও সম্ভব। বলের প্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন কাজকে সহজ করে যেসব কল তাদের বলা হয় যন্ত্র। এই অধ্যায়ে তোমরা বল সম্বন্ধে জানবে। সেই সাথে সরল কিছু যন্ত্র সম্বন্ধেও জানবে।

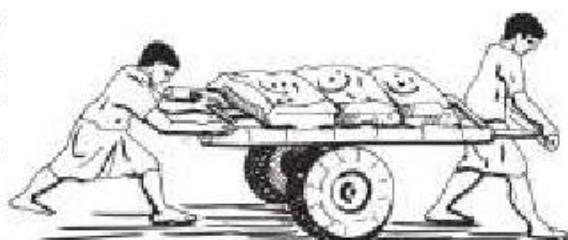
এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্রের সুবিধা তুলনা করতে পারব।
- মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সরল যন্ত্রের কাজের তুলনা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রভাব এবং সরল যন্ত্রের অবদান উপলক্ষ্য করব।
- ব্যবহারিক জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ : বল কী?

তোমরা কি জান যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জানা বা অজানা বিভিন্নভাবে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। তোমরা ভাবছ এই বলটা আবার কী? সকাল থেকেই শুরু হয় আমাদের নানাভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ। ঘৃত থেকে উঠে মুখ খোয়ার জন্য পানির কল ছাড়তে বা টিউবওয়েলে চাপ দিতে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। এমনকি পড়তে বসার সময় চেয়ারকে টেনে বসতেও বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার ধর, তোমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে তোমার জ্যামিতি বক্সটি আছে। এটিকে বের করতে এবং বের করার পর পুনরায় ড্রয়ারটিকে বন্ধ করতে ড্রয়ারটিকে

যথাক্রমে টান বা ধাক্কা দিতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ঘরের বাতিটি জ্বালানোর জন্য সুইচটি অন করেছ। এটিতেও কিন্তু বলের প্রয়োগ হয়েছে। কাউকে কি কোকের ক্যান খুলতে দেখেছ। এটিও কিন্তু বল প্রয়োগ। ফুটবলে লাথি দেওয়া বা ক্রিকেট বলে ব্যাট দিয়ে আঘাতও বল। উপরোক্ত ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ



চিত্র ১১.১ : বল হচ্ছে ধাক্কা বা টান

করলে দেখা যাবে অত্যোক্তি ঘটনার সাথে দুটি জিনিস জড়িত- ধাক্কা বা টান। এই ধাক্কা বা টানই হলো বল।

বস্তুর ওপর বলের বিভিন্ন প্রভাব

তোমার তো নিশ্চয়ই একটি রবার আছে। তুমি কি কখনও দেখেছ একে বাঁকালে, মোড়ালে, চেপে ধরলে বা ৩^ঠ টানলে এর আকৃতির কিন্তু পরিবর্তন হয়। এই বাঁকালো, মোড়ানো, চাপা, লম্বা করার চেষ্টাও হলো ৪^ঠ একই বস্তুর ওপর বল প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি। এগুলোর কি চিত্র অঙ্কন করতে পারবে?

আরেকটি মজার ঘটনা লক্ষ কর। মার্বেল দিয়ে কি কখনো খেলেছ? প্রথমে মার্বেলগুলো সামনে ছড়িয়ে রাখতে হয়। পরে একটু দূর থেকে অন্য একটি মার্বেল দ্বারা ছড়ানো মার্বেলগুলোর মধ্যে কোনো একটিকে আঘাত করার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হয়। যখন তুমি তোমার হাতের

মার্বেলটি ছুড়বে তখন এটি তোমার লক্ষ্যের মার্বেলটিকে আঘাত করলে তুমি কী দেখতে পাবে? দেখবে মার্বেলটি আঘাতপ্রাণ হওয়ার পর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হয়েছে। হয়ত দেখবে এটি আবার অন্য কোনো স্থির মার্বেলকে আঘাত করেছে। অথবা মোট একই গতিতে চলমান রয়েছে। গতিপ্রাণ মার্বেলটির উপর কোনো বল প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এই গতি চলতে থাকবে। অন্য কোনো বল না থাকলেও মাটির ঘর্ষণ বলহী এক সময় মার্বেলটিকে থামিয়ে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো একটা মাইক্রোবাস হয়ত রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ল। তখন হয়তো একে পুনরায় চালু করার জন্য ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। তখন একজন হয়তো একে ধাক্কা দিলে এটি নাও নড়তে পারে। কিন্তু $8/5$ জন একসাথে ধাক্কা দিলে এটি নড়তে পারে এমনকি চলতেও পারে। এখনে বল প্রয়োগের ফলে স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়।

এখন বলতে পারবে এখানে কী কী ঘটনা ঘটেছে। বলের অভাবে মার্বেলের গতির বিভিন্ন পরিবর্তন হলো। একইভাবে সাধারণত বল প্রয়োগে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়, গতিশীল বস্তুর গতি বাড়ানো বা কমানো যায় এবং গতিশীল বস্তুকে থামানো যায়। উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বল প্রয়োগের ফলে-

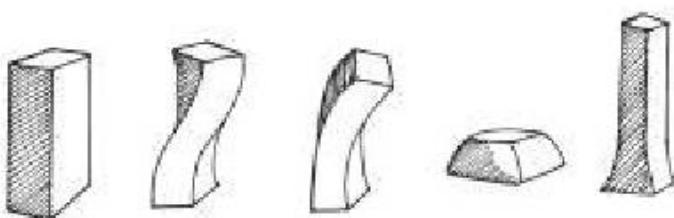
- কোনো স্থির বস্তু গতিশীল এবং গতিশীল বস্তু স্থির হয় বা হতে চায়।
- চলত বস্তুর গতি বাড়তে বা কমতে পারে।
- চলত বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন হয়।
- কোনো বস্তুর আকার বা আকৃতি পরিবর্তন হয়।

অনুরূপভাবে বলা যায়, যা কোনো স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা যা কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতি, আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই বল।

বৈদ্যুতিক সুইচ 'অফ' বা 'অন' করা, কোকের ক্যানের মুখ খোলা, মসলা পেষা, বোৰা তোলা, চিল ছুঁড়ে মারা, নৌকা বাওয়া, চলাফেরা করা, বিম্পিটারের মাউসে ক্লিক করা ইত্যদি ক্ষেত্রে বলের ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে ঠেলাগাড়ি, রিকশা প্যাডেল সবকিছুতেই বলের প্রয়োগ দেখা যায়।

পাঠ-৩ : সরল যন্ত্র

এক খঙ পাথর বা ইটের উপর ঠেস দিয়ে লম্বা লোহা অথবা কাঠের দণ্ডের এক প্রান্তে বল প্রয়োগ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে ভারী কোনো বস্তুকে উপরে তুলতে বা সরাতে দেখেছ নিচয়? হ্যাঁ লোহা বা কাঠের



চিত্র ১১.২ : বস্তুর উপর বলের প্রভাব

দণ্ডিকে বিশেষ এই ব্যবস্থায় ব্যবহার করার ফলে ভারী কোনো বস্তুকে সরানোর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যেতে পারে। তোমার শ্রেণিকক্ষে এই ধরনের কাজ সহজেই করে দেখতে পার। এ ফ্রেঞ্চ লোহা বা কাঠের দণ্ডের এভাবে ঠেস দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে এটি একটি সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা সহজেই কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। মূলকথা, কম বল প্রয়োগেও আধিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র ১১.৩ : সরলযন্ত্র

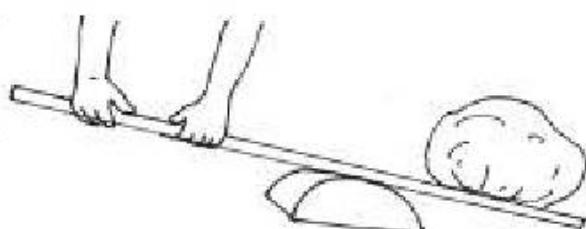
কাজকে এভাবেই সহজ করার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাবিধ সরলযন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। যেমন: কাঁচি, সাঁড়াশি, হাতুড়ি, শাবল, কপিকল, লিভার ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌশল প্রয়োগ করে কাজকে সহজ করা যায়। উপরে উল্লিখিত সরল যন্ত্র নিম্নোক্ত এক বা একাধিকভাবে কাজকে সহজ করে।

- প্রযুক্ত বলকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।
- কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ সম্পন্ন করে।
- বলকে কোনো একটি সুবিধাজনক দিকে প্রয়োগ করে।
- কাজকে নির্দিষ্ট একটি উপায়ে সম্পন্ন করে যা অন্য কোনো উপায়ে করা কঠিন।
- গতি ও দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সকল যন্ত্রেই কাজ করতে বাইরে থেকে শক্তির প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা আরও কিছু সরল যন্ত্রের সাথে পৃথক পৃথকভাবে পরিচিত হবে এবং এদের থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করা শিখবে।

পাঠ-৪ : লিভার

লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র, যাতে একটি শক্ত দণ্ড কোনো অবলম্বনের কোনো কিছুর উপর ভর করে মুক্তভাবে উঠানামা করে বা ধোরে, পাঠ-৩-এ বর্ণিত ঘটনার দন্ত এবং পাথর বা ইটের ব্যবস্থায় যেমন হয়। লিভারের ব্যবহারের আরেকটি সাধারণ উদাহরণ হলো শাবলকে ইট বা পাথরের উপরে ভর করে কোনো ভারী বস্তুকে উঠাতে সাহায্য করা। এখানে ভারী বস্তু হলো ভার এবং এই ভারকে উঠাতে যে বল প্রয়োগ করা হয় তা হলো প্রযুক্ত বল। শক্ত দণ্ডটি কোনো অবলম্বনের যে বিন্দুতে ঠেকানো অবস্থায় মুক্তভাবে উঠানামা করে বা



চিত্র ১১.৪ : লিভার

^ঝ ধোরে তা হলো ফগলক্রাম। লিভার কোনো ভারী বস্তুকে কম বল প্রয়োগ করে উঠাতে বা সরাতে সাহায্য করে।
^ঝ এখানে যান্ত্রিক সুবিধা হলো— যান্ত্রিক সুবিধা = $\frac{\text{ভার}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$

এখন তোমাকে বুঝতে হবে কীভাবে লিভার ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়। লিভারের নীতিমালা হলো নিম্নরূপ : বল \times বলবাহুর দৈর্ঘ্য = ভার \times ভারবাহুর দৈর্ঘ্য

এখানে বল যে বিদ্যুতে প্রযুক্ত হয় তা থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো বলবাহুর দৈর্ঘ্য। অনুরূপভাবে ভার থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো ভারবাহু। তাহলে উপরের নীতিমালা থেকে নিরূপিতভাবেও বোঝা যায়।

$$\frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}}$$



চিত্র ১১.৫ : লিভার

এখানে নির্দিষ্ট বল দ্বারা কীভাবে নির্দিষ্ট ভরের বক্তৃকে উঠানো বা সরানোর ফ্রেন্টে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করব তা একটি কাজের মাধ্যমে দেখব।

কাজ : একটি পেনসিলকে রুলারের সাথে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে একটি লিভার তৈরি করো। এখানে পেনসিলটি ফালক্রাম হিসেবে কাজ করবে। এবার প্রথমেই রুলারটিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে ভূমির সমান্তরাল করো। এবার দুই পাশে পাঁচটি করে ৫ টাকার মুদ্রা এমনভাবে রাখো। যেন পুনরায় রুলারটি ভূমির সমান্তরাল হয়। এবার ডান দিকে পুনরায় আরও ৫টি মুদ্রা রাখ। কী হবে! নিচয়ই ডান দিকটি ঝুঁকে পড়েছে? এবার পুনরায় রুলারটি সামনে পিছনে করে বাম প্রান্তে ৫টি এবং ডান প্রান্তে ১০টি মুদ্রা রেখে ভূমির সমান্তরাল করো। এতে কী হলো? ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমে গেলো। এবং বলবাহুর দৈর্ঘ্য বেড়ে গেলো। একে আমরা বলতে পারি যান্ত্রিক সুবিধা আদায় হলো। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা হয়েছে। পুনরায় আরও ৫টি পয়সা দিয়ে দেখ কী হয়।

পাঠ ৫-৬ : লিভারের শ্রেণিবিভাগ

প্রযুক্ত বল, ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

প্রথম শ্রেণির লিভার: এই ফ্রেন্টে ফালক্রামের অবস্থান প্রযুক্ত বল ও ভারের মাঝাখানে থাকে। যেমন: কঁচি, সাঁড়াশি, নিতি, নলকুপের হাতল, পানি সেচের দোন, টেকি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার: এই ফ্রেন্টে ভার থাকে মাঝাখানে এবং প্রযুক্ত বল ও ফালক্রাম দুই প্রান্তে অবস্থান করে। যেমন: জাঁতি, এক চাকার টেলা গাড়ি, বোতল খোলার যন্ত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণির লিভার: এই ফ্রেন্টে প্রযুক্ত বলটি মাঝাখানে কার্যকর হয়। ভার ও ফালক্রাম থাকে দুই প্রান্তে। যেমন: চিমটা।

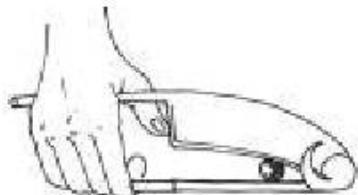
এখন এই কঁচি, যাঁতি বা চিমটা ব্যবহার করে কীভাবে কাজকে সহজে করা যায় তা দেখব।

প্রথমত : কাঁচি দিয়ে কিছু কাটার সময় উক্ত বস্তু (যেমন কাপড়) যত বেশি ফালক্রামের কাছে রেখে কাটা যাবে ততই কাটা সহজ হবে। মূলত এফেতে ভার বাহুর দৈর্ঘ্যকে কমানোর চেষ্টা করে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।



চিত্র ১১.৬ : কাঁচি

দ্বিতীয়ত : জাঁতির ক্ষেত্রে ভর (যেমন সুপারি) কে যত বেশি ফালক্রামের কাছে রাখা যাবে, সুপারি কাটতে তত কম বল প্রয়োগ করতে হবে। এফেতেও ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বলবাহুর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.৭ : জাঁতি

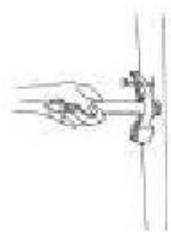
তৃতীয়ত : একটি চিমটা দিয়ে কিছু আটকানোর ক্ষেত্রে আঙুলের চাপটি যত বেশি বস্তুর কাছাকাছি হবে বস্তুটিকে আটকে রাখা তত বেশি সহজ হবে। এখানেও মূলত বলবাহুর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে বা ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে কাজ সহজ করা হয়।



চিত্র ১১.৮ : চিমটা

পাঠ-৭ : হাতুড়ি

একটি হাতুড়ির সাধারণত দুই প্রান্ত থাকে। এক প্রান্ত দিয়ে কাঠে লোহা চুকানো হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে কাঠ থেকে লোহা বের করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে যখন লোহা বের করা হয় তখন হাত দিয়ে হাতুড়িটির হাতল ধরে বল প্রয়োগ করা হয়। আবার যেখানে লোহাটি থাকে তার পাশে চেস দিয়ে এটি উঠানো হয় যেটি ফালক্রাম হিসেবে কাজ করে। এফেতে লোহা বের করার বাধা ভার হিসেবে কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মাঝাখানে কাজ করে বিধায় এটি প্রথম শ্রেণির লিভারের মতো কাজ করে।



চিত্র ১১.৯ : হাতুড়ি

সাঁড়াশি

এটি ও লিভার হিসেবে কাজ করে। সাঁড়াশির যেখানে হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটিতে বল এবং যে প্রান্তটিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা যায় সে প্রান্তটিতে ভার কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মধ্যে থাকে বলে এটি প্রথম শ্রেণির লিভারের অন্তর্ভুক্ত। এটিতে ভারবাহুর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়, তাই কেবলমাত্র বলবাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে এর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.১০ : সাঁড়াশি

পাঠ ৮-৯ : হেলানো তল ও কপিকল

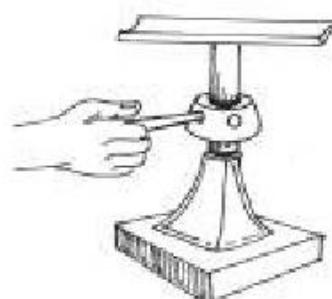
হেলানো তল

হেলানো তল হলো একটি সরল যন্ত্র। এর সাহায্যে একটি ভারী বস্তুকে খাড়াভাবে তোলার চেয়ে এটাকে গড়িয়ে উপরে তোলা যায়। হেলানো তলের ব্যবহারে কাজ অনেক সহজ হয় বলেই উচু পুলে উঠার রাস্তা, দালানের ছাদে উঠার সিঁড়ি ইত্যাদি খাড়াভাবে তৈরি না করে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়। হেলানো তলের উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম। এটা বোঝার জন্য এর যান্ত্রিক সুবিধা বুবাতে হবে। হেলানো তলের যান্ত্রিক সুবিধা হলো:

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{হেলানো তলের দৈর্ঘ্য}}{\text{হেলানো তলের উচ্চতা}}$$

এখান থেকে বুকা যায় একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধা ও তত বেশি হবে।

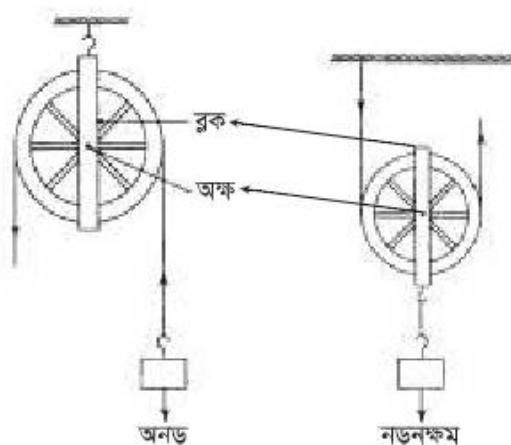
তোমরা কি কেউ দেখেছ কীভাবে একটি গাড়ির চাকা পরিবর্তন করা হয়? একটি সরলযন্ত্রের বা জ্যাক স্কু এর সাহায্যে তথমে গাড়িটির একপাশে উচু করা হয় যাতে সহজেই চাকা খুলে আবার লাগানো যায়। জ্যাক স্কু একসাথে লিভার ও হেলানো তলের নীতি মেনে কাজ করে। স্কুর পেঁচানো অংশের উচ্চতা হলো হেলানো তলের উচ্চতা এবং পেঁচানো পথ দিয়ে ঘূরে যেতে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা হলো হেলানো তলের দৈর্ঘ্য। এই যন্ত্রে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। অপর দিকে হাতলে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় ভার কাজ করে তার লম্ব বরাবর। ফলে জ্যাক স্কু একই সাথে বল বৃদ্ধি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।



চিত্র ১১.১১ : জ্যাক স্কু

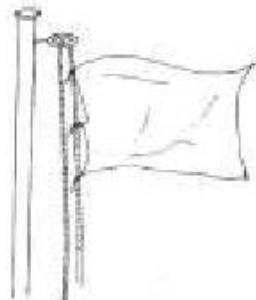
কপিকল

কপিকল হলো এক ধরনের সরল যন্ত্র। এতে একটি খাই কাটা চাকতি থাকে যাতে একটি রশি দুই দিকে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। কপিকলটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘোরে যা একটি স্থির ব্লকের সাথে সংযুক্ত থাকে। কপিকল সাধারণত কোনো ভারি বস্তু উপরে উঠাতে বা কুয়া থেকে পানি উঠাতে ব্যবহৃত হয়। কপিকল অনড় বা নড়নক্ষম হতে পারে। অনড় কপিকলে ব্লকটি স্থির থাকে, কেবলমাত্র চাকতি ঘোরে। অন্যদিকে নড়নক্ষম কপিকলে ব্লকটি স্থির নয় বরং কপিকলের সাথে এটিও ঘূরতে থাকে।



চিত্র ১১.১২ : কপিকল

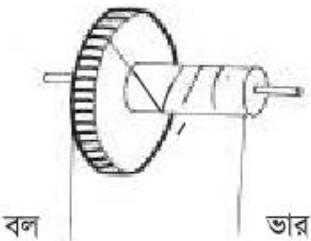
আমরা পতাকা উপরে উঠানোর জন্য অনড় কপিকল ব্যবহার করে থাকি। এক্ষেত্রে রশি টানার সাথে শুধু মাত্র চাকাটি ঘোরে। এখানে পতাকাকে যত উপরে উঠাবার প্রয়োজন হয় রশিকে তত নিচের দিকে টানতে হয়। ফলে এর মাধ্যমে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বলের দিক পরিবর্তন করা হয়।



চিত্র ১১.১৩ : পতাকা কপিকল

পাঠ ১০-১১ : চাকা- অক্ষদণ্ড

চাকা- অক্ষদণ্ড এক ধরনের সরলযন্ত্র। এটা মূলত লিভারেই ভিন্নরূপ। এখানে ভারকে একটি রশির মাথায় বাঁধা হয় এবং চাকাটিকে ঘুরিয়ে সে রশিটি অক্ষদণ্ডে জড়ানো হয়। চাকা ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাতের ওপর এর যান্ত্রিক সুবিধা নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের ৬ গুণ হয় তবে ১ কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে ৬ কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে উপরে উঠানো যাবে। তাহলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, চাকা অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এর চাকার ব্যাসার্ধ বেশি হওয়া প্রয়োজন। মোটরগাড়ির হেলিং, ক্লু-ড্রাইভার ইত্যাদি চাকা-অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করে।

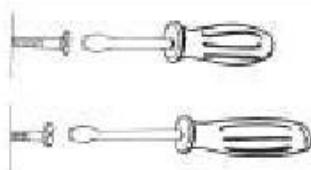


চিত্র ১১.১৪ : চাকা-অক্ষদণ্ড

কাজ : ক্লু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ২টি ভিন্ন আকৃতির ক্লু ড্রাইভার, দুটি সমান লম্বা ক্লু ও নরম কাঠ।

পদ্ধতি: প্রথম অপেক্ষাকৃত সরু-হাতলের ক্লু ড্রাইভারটি দিয়ে একজন শিক্ষার্থী ক্লুকে ঢুকাও। এক্ষেত্রে হাতলকে পাঁচবার সম্পূর্ণভাবে ঘুরাবে। অনুরূপভাবে অপেক্ষাকৃত মোটা হাতলের ক্লু ড্রাইভার ধারা ৫ বার ঘুরিয়ে দেখো। কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে? এই পার্থক্যই তোমাকে বলে দিবে ক্লু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা পেতে কী ধরনের ক্লু ড্রাইভার ব্যবহার করবে।

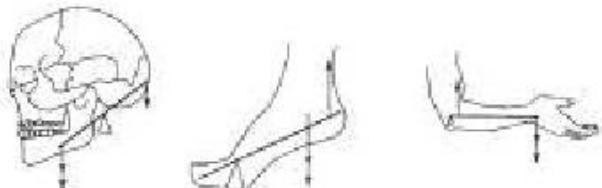


চিত্র ১১.১৫ : ক্লু ড্রাইভার

পাঠ ১২ : মানবদেহ ও সরলযন্ত্র

মানবদেহ একটি জটিল যন্ত্র। এর কোনো কোনো অঙ্গ সরলযন্ত্রের মতো কাজ করে থাকে। মূলত আমাদের শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসরণ করে কাজ করে থাকে। নিচে এমন তিনটি অঙ্গের সাথে পরিচিত হবে।

নিচের চিত্রগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কীভাবে মানুষের মুখের চোয়াল, পায়ের নিচের অংশ ও হাত সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এবার চিন্তা কর কীভাবে এই অঙ্গগুলো ব্যবহার করে কাজ করলে কোনো কাজকে সহজে করা যাবে। তুমি কি এখন বলতে পারবে আমরা খাবার চিবানোর সময় সামনের দাঁত দিয়ে না চিবিয়ে কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে চিবাই?



চিত্র ১১.১৫ : মানবদেহ ও সরল যন্ত্র

কাজ : একটি পাথর (১ কেজির মতো) তোমার আঙুলের ডগা থেকে কুনই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রেখে অনুভব কর কেমন লাগছে। এর থেকে বুঝা যাবে হাতকে কীভাবে ব্যবহার করলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

নতুন শব্দ : স্থির বস্তু, গতিশীল বস্তু, যান্ত্রিক সুবিধা, লিভার, ফালক্রাম, চাকা, অফনডও ও কপিকল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর অবস্থান, আকার, আকৃতি বা গতির পরিবর্তন হয় বা হতে পারে।
- সব সরল যন্ত্রেই কোনো একটি বিশেষ উপায়ে একটি কৌশল প্রয়োগ করা যায় যার দ্বারা ঐ যন্ত্র থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- লিভারের ফেত্রে বলবাহু বা ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- কোনো বস্তুকে হেলানো তল বরাবর একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য যে কোনো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।
- মানবদেহের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসারে কাজ করে থাকে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার কোনটি?

ক. কাঁচি

খ. সাঁড়াশি

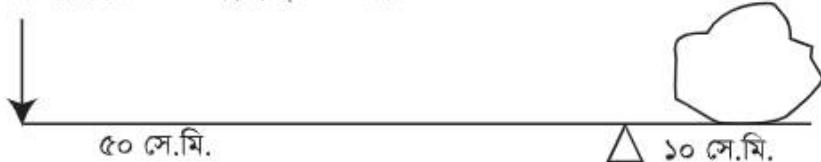
গ. চিমটা

ঘ. জাঁতি

২. হেলানো তল থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে | খ. দৈর্ঘ্য কমিয়ে |
| গ. উচ্চতা বাড়িয়ে | ঘ. উচ্চতা কমিয়ে |

উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা কত?

- | | |
|-------|--------|
| ক. ৫ | খ. ৮০ |
| গ. ৬০ | ঘ. ৫০০ |

৪. ভারবাহুর দৈর্ঘ্য ১৫ সে. মি বৃদ্ধি করা হলে যান্ত্রিক সুবিধা-

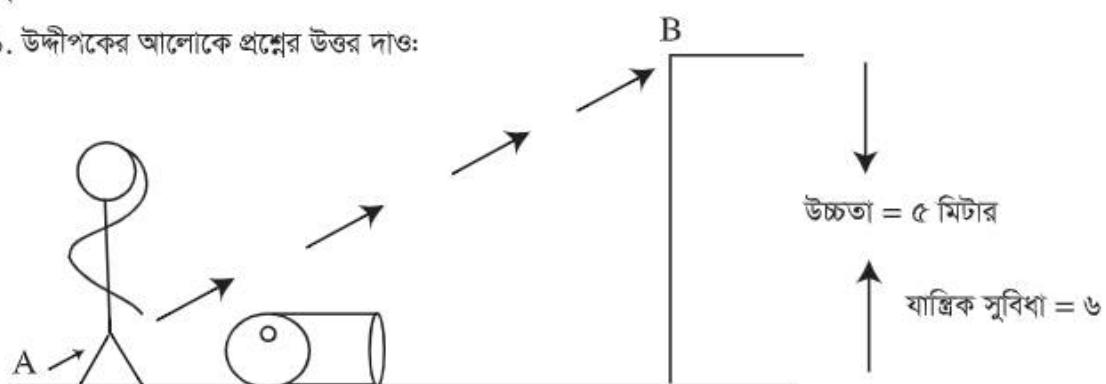
- i. কমবে
- ii. বাঢ়বে
- iii. সমান থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. i | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i ii ও ii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:



ক. ফালক্রাম, কী?

খ. সরলযন্ত্র কীভাবে কাজ করা সহজ করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. A থেকে B এর দূরত্ব নির্ণয় করো।

ঘ. লোকটি যে উপায় অবলম্বন করে ড্রামটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলতে পারবে তা সরলযন্ত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২. মনি ও শিল্পী স্ট্যাপলার ব্যবহার করে তাদের কাগজ স্ট্যাপল করছিল। মনি স্ট্যাপলারের সামনের অংশে চাপ দিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শিল্পী স্ট্যাপলারের মাঝাখানে চাপ দিয়ে কাজ করছে।

ক. লিভার কাকে বলে?

খ. কীভাবে ত্তীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. মনি ও শিল্পীর ব্যবহৃত যন্ত্রটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মণি ও শিল্পীর মধ্যে কে বেশি সহজে স্ট্যাপল করতে পারছে? ব্যাখ্যাসহ লেখো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। কাঁচি থেকে কীভাবে বাল্কিক সুবিধা পাওয়া যায়?

২। জ্যাক ছু কী ভাবে কাজকে সহজ করে? ব্যাখ্যা করো।

৩। ছু ড্রাইভারের হাতল কেমন হলে সুবিধা বেশী হয়? ব্যাখ্যা করো।

পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন

হাজার হাজার ধরে মানুষ চিন্তা করেছে কীভাবে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। তবে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী এখন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বে বলা হয় যে, মহা বিক্ষেপণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাবিশ্বের একটি গ্রহ পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের দিকটি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত -এ ধরনের ঘটনা থেকে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পৃথিবীর উৎপত্তির ঘটনা বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-২ : মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি

তোমরা জান, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। আমরা উপরের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দিনের বেলায় দেখি সূর্য। কখনও দেখি মেঘ। মেঘ না থাকলে রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, নক্ষত্র বা তারা। কখনও কী গ্রহ জেগেছে মনে, এই পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

বিভিন্ন সমাজে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে, একটি বিশাল ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্ম। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রায় ১৩৭০ কেটি বা ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্ব একটি অসীম ঘনত্বের ও প্রচন্ড উভ্রেক্ত বিন্দুভরে ঘনীভূত ছিল যা বিক্ষেপণ হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ বিক্ষেপণকে মহাবিক্ষেপণ বলা হয়।

মহাবিক্ষেপণের পর অতি ক্ষুদ্র পদার্থ কণা তৈরি

হয়। তারপর ছোট ছোট কণাগুলো কিছুটা ঠান্ডা ও একত্রিত হয়ে জ্যোতিকে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। একদিকে তখন ছোটো ছোটো কণা নিলে জ্যোতিক সৃষ্টি হচ্ছিল, একই সাথে তখন মহাবিশ্ব আরও সম্প্রসারিত হচ্ছিল।



চিত্র ১২.১ : মহাবিক্ষেপণ



চিত্র ১২.২ : মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের বেলুন মডেল

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদাৰ্থ, মহাকাশ সব কিছু এই বিক্ষেপণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধাৰণা কৰা হয় সূৰ্য যখন সৃষ্টি হয় তখন সূৰ্য যে ধূলিকণা ও গ্যাস থেকে তৈৰি হয়েছিল তাৰ কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণাৰ মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তাৰপৰ এখন থেকে প্ৰায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছৰ পূৰ্বে এই ধূলিকণা একত্ৰিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবিশ্বের সমৰ্থনে প্ৰমাণ : মহাবিশ্ব একটি মহাবিশ্বেরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তাৰ পক্ষে অনেক তথ্যপ্ৰমাণ রয়েছে। এৱ একটি প্ৰমাণ হলো, মহাবিশ্ব এখনও বিস্তৃত বা সম্প্ৰসাৰিত হচ্ছে। মহাকাশেৰ গ্যালাক্সি/ছায়াপথ ও তাৰাসমূহ একে অপৱেৰ কাছ থেকে দূৰে সৱে যাচ্ছে। কাজেই ধাৰণা কৰা হয় যে সুদূৰ অতীতে এৱা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্ৰ একটি জায়গায় ছিল; বিশ্বেৰণেৰ মাধ্যমে এৱা আলাদা হয়েছে।

পাঠ ৩-৪ : সূৰ্য, পৃথিবী ও চন্দ্ৰেৰ পৱিচয়

তোমৰা জেনেছ, আমৰা যে সৌৱজগতে বসবাস কৰি তা মিল্কি ওয়ে (milky way) বা আকাশ গঙ্গা ছায়াপথেৰ অংশ। আমাদেৰ মিল্কি ওয়ে ছায়াপথেৰ একটি নক্ষত্ৰ সূৰ্য। এটি একটি নক্ষত্ৰ কাৰণ এৱ নিজেৰ আলো আছে। সূৰ্য আসলে গ্যাসেৰ একটি পিণ্ড। এই গ্যাসেৰ পিণ্ডে হাইড্ৰোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকৰ্ষ বলেৰ সাহায্যে একত্ৰ হয়ে থাকে। হাইড্ৰোজেন গ্যাস পৰম্পৰেৰ সাথে যুক্ত হওয়াৰ সময় প্ৰচুৰ তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এৱপৰ সেই তাপ ও আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সূৰ্য অনেক পৱিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন কৰে। তা থেকে কিছু পৱিমাণ তাপ ও আলো আমাদেৰ পৃথিবীতে এসে পৌছায়। সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৰে মহাজাগতিক বন্ধ ঘূৰছে। সূৰ্য এবং একে কেন্দ্ৰ কৰে ঘূৰ্ণায়মান সকল মহাজাগতিক বন্ধ ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদেৰ সৌৱজগত গঠিত। সৌৱজগতেৰ বেশিৰ ভাগ জায়গাই ফাঁকা। সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৰে ঘূৰছে গ্ৰহ, উপগ্ৰহ, ধূমকেতু, ইত্যাদি মহাজাগতিক বন্ধ বা জ্যোতিক্ষ।

সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৰে স্বাধীনভাৱে ঘূৰছে আটটি গ্ৰহ। পৃথিবী এমনই একটি গ্ৰহ। পৃথিবীৰ আকৃতি গোলকেৰ মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদাৰ্থ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সূৰ্যেৰ মতো তাপ ও আলো উৎপাদন কৰতে পাৰে না। তাই আলো ও তাপেৰ জন্য পৃথিবী সূৰ্যেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। সূৰ্যেৰ আলোকে ব্যবহাৰ কৰে উক্তিদি খাদ্য তৈৰি কৰে। উক্তিদিৰ তৈৰি খাদ্যেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰাণীৱা বেঁচে আছে। সূৰ্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। এভাৱে সূৰ্যেৰ আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেৱকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমাদেৰ পৃথিবী সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৰে ঘোৱে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্ৰ কৰে ঘূৰছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীৰ উপগ্ৰহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন কৰতে পাৰে না। তাহলে চাঁদকে আমৰা আলোকিত দেখি কেন? আসলে সূৰ্যেৰ আলো চাঁদেৰ পৃষ্ঠে পড়ে প্ৰতিফলিত হয়। তাই আমৰা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন

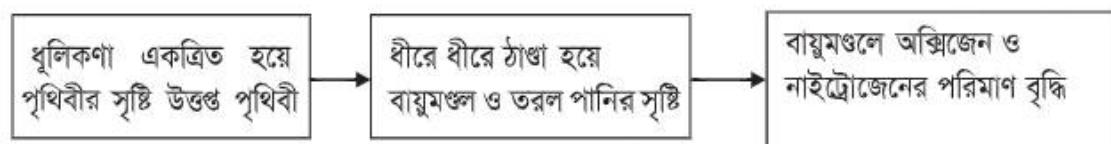
৮ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়ো। আকাশে তো সূর্য আর চাঁদকে প্রায় সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয়? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোটো দেখায়। আচ্ছা, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হয় তাহলে পৃথিবী কতটুকু?



চিত্র ১২.৩ : সূর্য ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনা

পৃথিবী তাহলে হবে একটা বালুকণার সমান। সূর্যের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ১০৯ গুণ বড়ো। আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে? ছোটো-বড়ো বা যে কোনো ধরনের জীব? বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন যে, অন্য কোথাও জীব আছে কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কী আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে?

ধারণা করা হয়, সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে গ্যাসও ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তার লক্ষ লক্ষ লক্ষ বছর পর এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। শুরুর দিকে পৃথিবী বেশ গরম ছিল। এত গরম ছিল যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ টেগবগ করে ফুটত। জীবনের জন্য যে তরল পানি দরকার তা ছিল না। বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। পৃথিবী এই অবস্থায় থাকলে কোন জীবের উদ্ভব হতো না।



প্রবাহচিত্র : পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ

ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে তাপ সরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ভারী পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাল্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি বায়ুমণ্ডল গঠন করেছে। এরপর পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হয়ে জলীয়বাল্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে। এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ায় পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে ও জীব টিকে থাকতে পারছে।

পাঠ ৫ : আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর গঠন

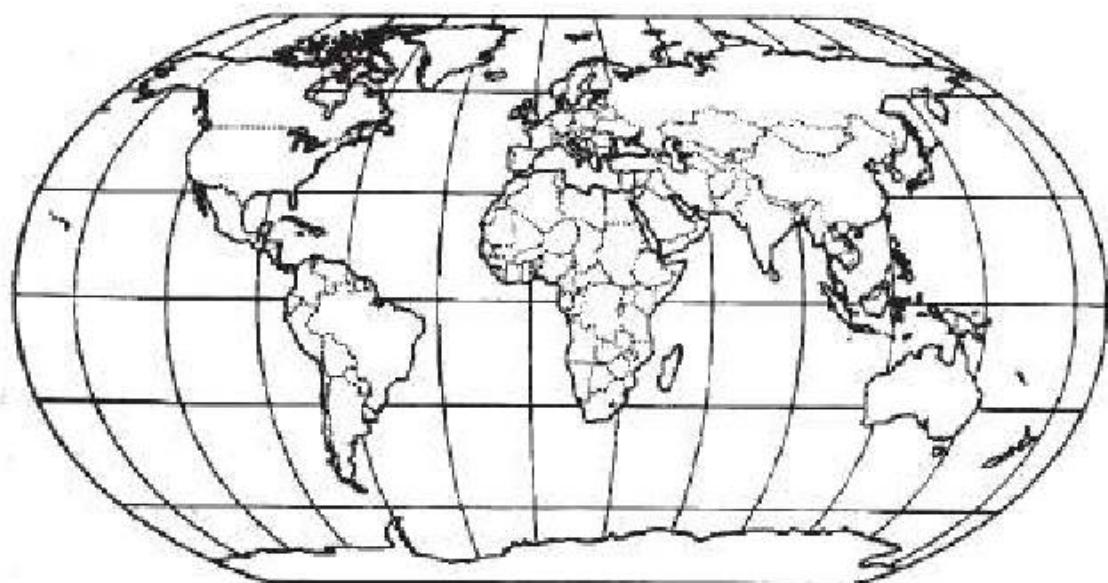
তোমরা জেনেছ সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে। একে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। তারপর কিছুটা ভারি পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলো মিলে তৈরি করেছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ।

বায়ুমণ্ডল : যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জানো যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোও পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোফ্রিয়ার। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ থাকে। তোমরা জেনেছ যে, মেঘ আসলে জলীয়বাষ্প দিয়ে তৈরি। ট্রিপোফ্রিয়ারের ঠিক ওপরেই স্তর হয়েছে স্ট্রাটোফ্রিয়ার। এই স্তর ট্রিপোফ্রিয়ারের ওপরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুণী রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে গ্যাসগুলো খুব কম পরিমাণে আছে।

পাঠ ৬ : ভূ-পৃষ্ঠ

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর বাস করি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ওপরে বায়ুমণ্ডল আর নিচের দিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে কেমন দেখি? পৃথিবীর পৃষ্ঠের কোন অংশ নরম মাটি, কোন অংশ শক্ত পাথর আর কোন অংশ পানি দ্বারা আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ স্তুল। পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখলেই তোমরা বিষয়টি বুঝবে। ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে বিশাল সাগর ও মহাসাগর। এছাড়া আছে লেক বা হ্রদ, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি।



চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীর মানচিত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশ। অন্য মহাসাগরগুলো হচ্ছে প্রশান্ত, আটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। সাগরের পানিতে প্রচুর মাছসহ নানা জীব বাস করে। সাগরের পানির উপর দিয়ে চলে মালবাহী জাহাজ।

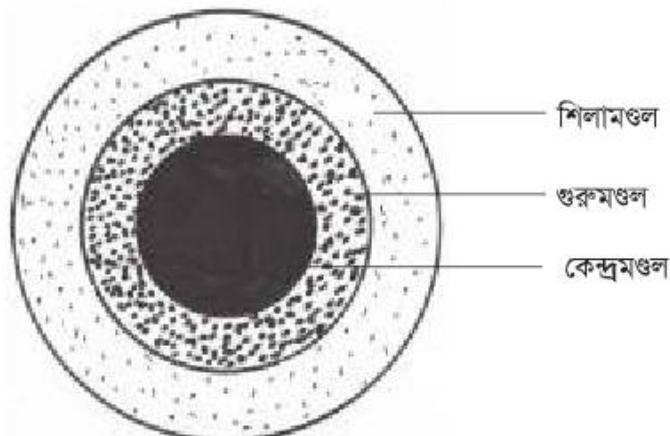
তোমরা জানো যে, বৃষ্টি ও বরফগলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

আসলে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার চূড়ায় অনেক বরফ জমা আছে। এই বরফগলা পানি যখন পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসে তখন সরু নদীর সৃষ্টি হয়। এই সরু নদীর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে নদী বড় হতে থাকে। নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলো এই বৃষ্টির পানি প্রচুর পরিমাণে বহন করে। তাই পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীগুলো বেশ বড়ো।

পাঠ-৭ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

পৃথিবীর ভেতরের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তা শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সন্তুর কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল আর সবশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে কেন্দ্রমণ্ডল (চিত্র-১২.৫)। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর বাইরের অংশ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপ চলে যাওয়ায় ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের দিক থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তোলন করে।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে থায় ২৯০০ কিলোমিটার ব্যাসার্দের গোলকাকার জায়গা হলো কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে নিকেল, লোহা, সীসা ইত্যাদি ধাতু উত্তোলন করে আছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের অংশে এরা কঠিন কিন্তু বাইরের দিকে এরা গলিত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝে রয়েছে গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের বেশির ভাগই কঠিন। কিন্তু এর কিছু অংশ আধা-গলিত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, আয়োগিগ্রাহীর উদ্দীরণে এই অংশটি থেকে গলিত লাভ বের হয়ে আসে।



চিত্র ১২.৫ : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে বেশি দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তোমরা বড়ো হয়ে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল সম্পর্কে আরও জানবে। তোমরা এই শ্রেণিতে কিছুটা জানবে শিলামণ্ডল সম্পর্কে।

পাঠ ৮ : প্লেট টেকটনিক এবং আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ও ভূমিকম্প

মানুষ সবসময়ই জানতে চেয়েছে কেন ভূমিকম্প হয়? জানতে চেয়েছে কেন আগ্নেয়গিরির উদগীরণ হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা দিয়ে ভীষণ উভচ তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে? বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এ তত্ত্ব সকলের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব : এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, ভূপৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলো গুরুমণ্ডলের আংশিক তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে। এই প্লেটগুলো প্রতিবছরে কোনো একদিকে কয়েক সেন্টিমিটার সরে যায়। প্লেটগুলো কখনো একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যায়। আবার কখনো কখনো একে অন্যের দিকে আসে। কখনো কখনো প্লেটগুলো বছরে কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠে বা নিচে নামে। একটি প্লেটের সাথে আরেকটি প্লেট যেখানে মেশে সেখানেই বেশি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটে। প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে উচু পর্বত থাকলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা আরও বাঢ়ে।

ধারণা করা হয়, প্লেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ঘৰা বা ধাক্কা খেলে সেখানে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থ গলে যায়। এ গলিত পদার্থ চাপের ফলে নিচ থেকে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একেই আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলে। ভূঅভ্যন্তরে উত্পন্ন ও গলিত শিলা ম্যাগ্মা নামে

পরিচিত এবং বেরিয়ে আসা
গলিত তরল পদার্থকে সাভা
বলে। একইভাবে প্লেটগুলো
একটি অন্যটির সাথে ধাক্কা
খেলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে।
একেই ভূমিকম্প বলে।
আজকাল বাংলাদেশেও ভূমিকম্প
সংঘটিত হচ্ছে।



চিত্র ১২.৬ : আগ্নেয়গিরি ও নির্গত সাভা

পাঠ ৯-১০ : ভূ-ভূক ও মাটি

শিলামণ্ডলের উপরের দিকের অংশ ভূভূক নামে পরিচিত। ভূভূক হয় পানি নয়ত মাটি দ্বারা আবৃত। ভূভূকের বেশির ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। বাকি অংশটি গুড়ো বা ভাঙা পাথুরে পদার্থ দ্বারা আবৃত। ভূ-ভূকের উপরের অংশটি যখন নানা ধরনের জৈব পদার্থ এবং পাথুরের গুড়ো দ্বারা গঠিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত নরম হয় তখন তাকে মাটি বলে। ভূভূক মানুষের জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুতৃপ্ত অংশ। এ অংশের উপরে আমরা বসবাস করি। মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করি। এছাড়াও এ অংশে রয়েছে খনিজ পদার্থ যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

মাটি গঠন প্রক্রিয়া : সাধারণত পাথর, নূড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি দ্বারা ভূত্বক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের অংশ। ভূ-ভূক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থের সাধারণ নাম শিলা। কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় সাধারণত দুটি পর্যায়ে:

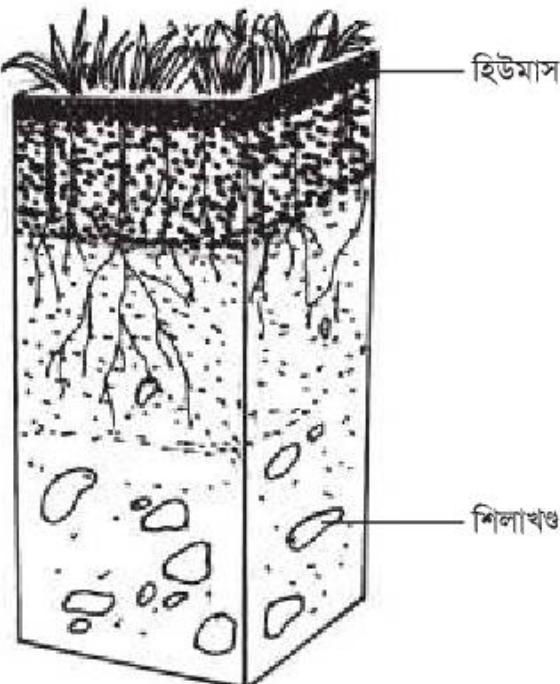
১. **প্রথম পর্যায় :** কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোদ, বৃষ্টি, বাড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এছাড়া বায়ু, বরফ বা পানির প্রবাহ ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের কারণে অন্য জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে জমা হয়।
২. **দ্বিতীয় পর্যায় :** ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ক্ষুদ্র জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ যোগ হয়।

বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসঞ্চাল করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এই হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এ জন্য কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশে নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। বন্যার পানি পলিমাটি বয়ে আনে। নদীর কাছাকাছি এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরোনো হয় না। এ মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

খনিজ পদার্থ

আগেই বলা হয়েছে যে, ভূ-ভূক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর কিছু অংশ জৈবপদার্থ দিয়ে গড়া। আরও আছে অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশের মধ্যে অনেক সময় একাধিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কখনো একটি অজৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থ বলে। খনিজ পদার্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদেরকে মানুষ তৈরি করে না, এদেরকে প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। চুনাপাথর একটি খনিজ পদার্থ।



চিত্র ১২.৭: মাটির গঠন

চুনাপাথর আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামের একটি পদার্থ। বাংলাদেশের জয়পুরহাটে ও সিলেটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজসম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা উপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। দরকারি অনেক খনিজসম্পদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। গাঢ়ি, বাস, লঞ্চ এগুলোও তৈরি হয় লোহা থেকে।

টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/তারকাঁটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও লোহা থেকে তৈরি। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাঁড়ি-পাতিল, চামচ তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো অ্যালুমিনিয়ামও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। তামা, রূপা, সোনা, দস্তা এসব দরকারি ও দামি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য এসব খনিজসম্পদ বেশি পরিমাণে নেই।

কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে পাওয়া গেলেও এদেরকে খনিজ পদার্থ বলা হয় না। কারণ এরা জীবদেহ থেকে তৈরি, এরা অজৈব নয়। বড়ো বড়ো গাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে এরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়েছে। জীবদেহ থেকে তৈরি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন : প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কোটি কোটি বছর আগে একটি মহাবিক্ষেপ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে পৃথিবী ও আরও সাতটি গ্রহ। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হলো চাঁদ।
- সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল। ধীরে ধীরে এটি ঠাণ্ডা হয়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। পৃথিবীতে পানি ও নানা রকম গ্যাস আছে বলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর তিনটি অংশ- বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ ও ভেতরের অংশ। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নানা গ্যাস। ভূপৃষ্ঠ ঢাকা আছে পানি, মাটি ও শিলা দ্বারা।
- বরফগলা পানি ও বৃক্ষের পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হওয়ায় ফলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর ভেতরের অংশ বা অভ্যন্তর আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আছে কেন্দ্রমণ্ডল, মাঝখানে গুরুমণ্ডল আর উপরের দিকে শিলামণ্ডল।
- শিলামণ্ডল কতগুলো প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্র্যৎপাত হয়।
- কঠিন শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ মিলে মাটি তৈরি হয়।
- মাটির নিচে রয়েছে অনেক দরকারি পদার্থ। এদের মধ্যে অজৈব পদার্থকে বলে খনিজ পদার্থ। এছাড়া রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়?

- ক. ঢাকা
গ. বরিশাল

- খ. সিলেট
ঘ. খুলনা

২. কয়লা ও পেট্রোলিয়ামকে জীবাশ্য জ্বালানি বলা হয়। কারণ এগুলো-

- i. জৈব পদার্থ
- ii. অজৈব পদার্থ
- iii. জীবদেহ হতে তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১ম স্তর

২য় স্তর

৩য় স্তর

৪র্থ স্তর

মাটির বিভিন্ন স্তর

৩. কোন স্তরের মাটি কম কালো এবং উজ্জ্বল হয়?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. ১ম স্তর | খ. ২য় স্তর |
| গ. ৩য় স্তর | ঘ. ৪র্থ স্তর |

৪. ১ম স্তরটি গঠিত হয়-

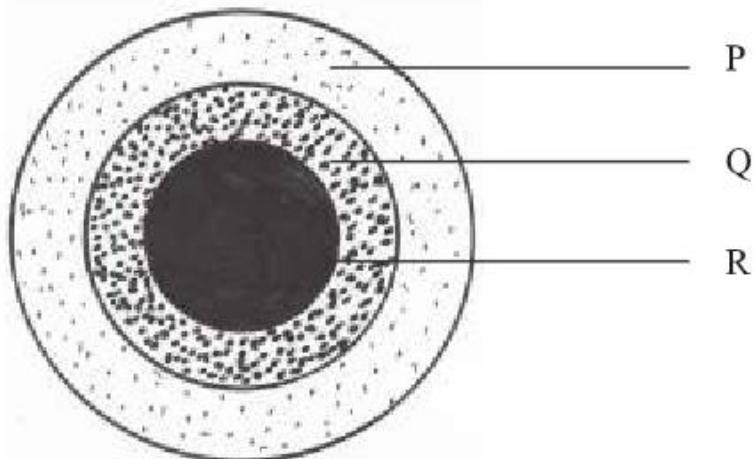
- i. শিলাকণা দিয়ে
- ii. হিউমাস দিয়ে
- iii. পচা ও মৃত জীবদেহ দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্বীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও:



পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ বা উর

- ক. ভূ-ত্বক কাকে বলে?
- খ. ভূগৃষ্ঠ শীতল হলেও কেন্দ্রমণ্ডল উত্তপ্ত কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. P অংশটির গঠন বর্ণনা করো।
- ঘ. Q ও R এর কোন স্তরটি ভূমিকম্প ও আঘেয়গিরির উদগীরণের জন্য দায়ী? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

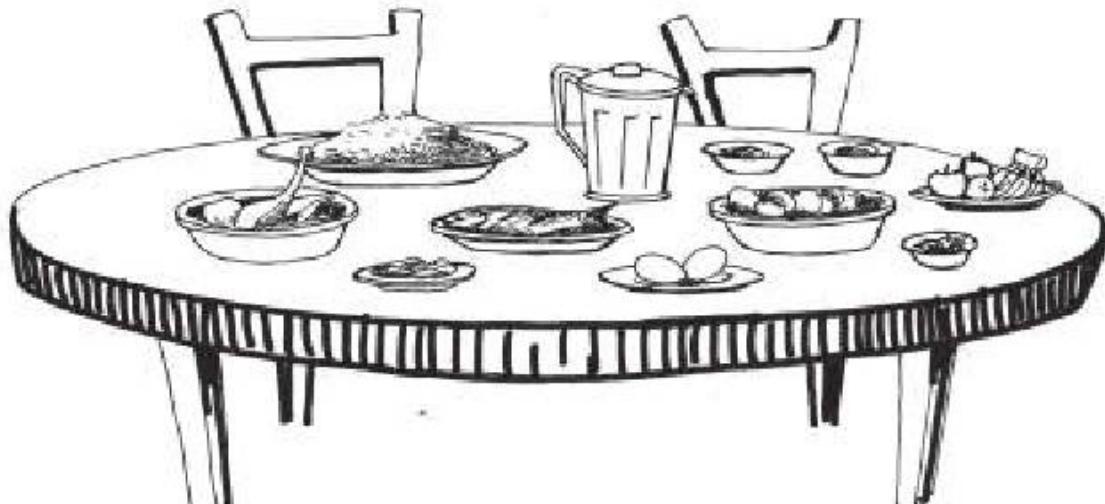
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কীভাবে সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।
২. ভূগৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. প্লেট টেক্টনিক তত্ত্বটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা করো।

অয়োদশ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু দেখতে পাই। এই খাদ্য বস্তুগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অজৈব ও জৈববস্তু। শর্করা, প্রোটিন, চর্বি বা প্রেহ ইত্যাদি আমরা জীব থেকে পাই। এগুলো জৈববস্তু। এ বস্তুগুলো আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। খাদ্য ও পুষ্টির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া, যা জটিল খাদ্যকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। এ অধ্যায়ে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিশদ জানতে পারব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সুব্যবস্থার তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

পাঠ-১ : খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য কী? হাঁটা চলা, বাগানে কাজ করা, কুয়া থেকে পানি তোলা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা বা ফুটবল খেলা ইত্যাদি কাজ করার পর আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের শুধা পায়। আমরা তখন কী করি? আমরা খাবার খাই। খাবার খাওয়ার পর আমরা কী রকম বোধ করি? শক্তি ফিরে পাই। খাদ্য আমাদের শক্তি দেয় ও কাজ করার ক্ষমতা জোগায়।

মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, শ্রয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা অর্জন, শারীরিক সুস্থিতা ইত্যাদির জন্য খাদ্য প্রয়োজন। দেহের কাজকর্ম সুস্থুরণে পরিচালিত করে, দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য।

খাদ্য আমাদের শক্তি জোগায়, শ্রয়পূরণ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাবার খাই।

পুষ্টি কী?

আমরা প্রতিদিন আমাদের চাহিদামতো চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারি ও কঁচা ফলমূল খেয়ে থাকি। এ খাবারগুলো সরাসরি আমাদের দেহ গ্রহণ করতে পারে না। এই জটিল উপাদান সমূক খাবারগুলো আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে পরিপাক বা হজম হয়ে দেহে প্রবহণের জন্য শোষণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। রক্তের মাধ্যমে জীবকোষ এই সরল উপাদানগুলো শোষণ করে নেয়। এই পরিশোষিত ও দেহকোষে জমাকৃত খাদ্য উপাদান দেহের বৃদ্ধি, শ্রয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাঢ়াতে সাহায্য করে। এই সঙ্ঘূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পুষ্টি। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে ও কাজ করার শক্তি জোগায়। আমাদের দেহে খাদ্যের নানা রুকম কাজ রয়েছে। যেমন: তাপ উৎপাদন, দেহের শ্রয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন।

নতুন শব্দ: পুষ্টি ও খাদ্য উপাদান।

পাঠ-২: খাদ্যের প্রকারভেদ

মৌরুসী আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙ্গা খেতে পছন্দ করে, রবিনের পছন্দ মাছ, মাংস, মিষ্টি আর তুলির পছন্দ 'পাউরটি, বিস্কুট, চিঙ্গ ইত্যাদি। আমরা একেক জন একেক ধরনের খাবার পছন্দ করি। খাবার গুলো পছন্দ করি তাদের স্বাদের ভিন্নতার কারণে। অর্থাৎ একেক ধরনের খাবারের স্বাদ একেক ধরণের। স্বাদ তবে স্বাদ ভিন্ন হলেও সব ধরনের খাবারই আমাদেরকে খেতে হয়। কারণ সব খাবারই আমাদের শরীরের সুস্থিতার জন্য প্রয়োজন এ খাবারগুলো ভিন্ন স্বাদ ও গুণাগুণের দিক থেকে আলাদা। স্বাদ ও গুণাগুণ বিচারে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: শর্করা, প্রেটিন বা আমিষ, ও স্নেহজাতীয় 'খাদ্য। এ তিন প্রকার খাদ্য আমাদের দেহগঠন, শ্রয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি জোগায়। এছাড়া খনিজ লবণ, 'ভট্টাচার ও পানি হলো আরো তিন প্রকার খাদ্য উপাদান। এ উপাদানগুলো দেহকে রোগমুক্ত ও সবল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা

যেসব খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা, চিনি, গুড় ইত্যাদি। প্রধানত উচ্চিজ্জ উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ জাতীয় খাদ্যই বেশি খাই। আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করে কোনো খাদ্যে শর্করা আছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। শর্করা আয়োডিন দ্রবণের রঙের পরিবর্তন করে।



ভাত



আলু



গম



চিনি

চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করার কাজ

১. শর্করা সহজে হজম হয়, দেহের কাজ করার শক্তি জোগায় ও তাপ উৎপন্ন করে।
২. শর্করায় বিদ্যমান সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

কাজ : শর্করা চেনার উপায় পরীক্ষণের জন্য একটি টেস্টটিউবে অথবা কাচপাত্রে সামান্য পরিমাণে আটা গুলে নাও। মিশ্রণটি টেস্টটিউবে নিয়ে জুলন্ত স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধর। মিশ্রণটি গরম হলে, এই মিশ্রণে দুই ফেঁটা পাতলা আয়োডিন দ্রবণ ভালো করে মিশিয়ে নাও।

দেখ কী ঘটে? মিশ্রণটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? মিশ্রণটি গাঢ় বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। অতএব আটা শর্করা জাতীয় খাদ্য। মিশ্রণে বা খাদ্যে শর্করা থাকার কারণে আয়োডিনের রঙের পরিবর্তন ঘটেছে।

নতুন শব্দ : সেলুলোজ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রোটিন।

পাঠ-৩ : প্রোটিন বা আমিষ

রহিম সাহেবের বড়ো ছেলে শাহিনের পছন্দ মাছ ও ডিম, আর ছোটো ছেলে কবিরের পছন্দ মাংস ও দুঃখজাত খাদ্য। এগুলো কী জাতীয় খাদ্য? এগুলো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ প্রোটিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুঃখজাত দ্রব্য প্রোটিনের উৎস প্রাণী, তাই এগুলো প্রাণিজ প্রোটিন। অপরাদিকে ডাল, বাদাম, শিম ও বরবর্তির বীজ ইত্যাদির উৎস উদ্ভিদ, এগুলো উদ্ভিজ প্রোটিন।

প্রোটিনের কাজ

১. প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহে বৃদ্ধির জন্য কোষ গঠন করা।

যেমন- দেহের পেশি, হাড় বা অঙ্গি, রক্ত কণিকা ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

২. দেহে শক্তি উৎপন্ন করা।

৩. প্রোটিন থেকে দেহে রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি তৈরি হয়।



চিত্র ১৩.২ : প্রোটিন

শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে কোয়াশিয়ারকর রোগ হয়। এ রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুদেহের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলে শিশু পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টিতে ভোগে।

কাজ : একটি টেস্টটিউবে সামান্য পানি নাও। এর ভিতরে ডিমের সাদা তরল অংশ ঢেলে দাও। এবার মিশ্রণটি স্পিরিট ল্যাম্পের আওনে গরম করো।

তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? ডিমের সাদা অংশটি শক্ত হয়ে গেছে। তরল প্রোটিন উত্তাপে শক্ত হয়ে যায়।

নতুন শব্দ : রক্তকণিকা, উদ্ভিজ প্রোটিন ও প্রাণিজ প্রোটিন।

পাঠ ৪-৫ : মেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ও ক্যালরি

যেসব খাদ্যে তেল বা চর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে, এদেরকে মেহ জাতীয় খাদ্য বলে। প্রোটিনের মতো মেহ জাতীয় খাদ্য দুই প্রকার। মাছের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণী থেকে পাই, এসব প্রাণিজ মেহ। সয়াবিন, বাদাম, সরিষা, তিল, জলপাই ইত্যাদির তেল উদ্ভিজ মেহ। মাংসের চর্বি, ঘি ও মাখন ইত্যাদি জমাট মেহ। সয়াবিন, সরিষা, তিল, জলপাই, বাদাম ইত্যাদির তেল তরল মেহ।

নেহ বা চর্বির কাজ

- দেহের তাপ ও কর্মশক্তি বাঢ়ায়, ভ্লকের নিচের চর্বিস্তরে দেহের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- দেহের প্রোটিনকে শক্ত থেকে রক্ষা করে।
- দেহে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-এর জোগান দেয়।



চিত্র ১৩.৩ : নেহ জাতীয় খাদ্য

কাজ : নেহ পদার্থ চেনার পরীক্ষণের জন্য এক টুকরো সাদা কাগজের উপর কয়েক ফোটা সয়াবিন তেল ফেলে কাগজের উপর ঘষে নাও। এবার আলোর দিকে কাগজটি ধরো। কাগজের যে জায়গায় তেলের ফোটা ফেলা হয়েছে সে জায়গাটি স্বচ্ছ মনে হচ্ছে কী?

কাগজের উপরের স্বচ্ছ জায়গাটির ভেতর দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে। এটা তেল বা চর্বি চেনার একটি সহজ পদ্ধতি।

ক্যালরি কী?

১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1° সেলসিয়াস বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ হচ্ছে ১ ক্যালরি। ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। শর্করা, প্রোটিন ও নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ আমাদের দেহের ভিতরে খাদ্যের পরিপাক, বিপাক, শ্বাসকার্য, রক্তসংবলন ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি ব্যয় হয়। খাদ্যে শক্তি সংরিত থাকে। আমরা খাবার থেকেই শক্তি পাই। খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক হলো কিলোক্যালরি।

যেসব খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন ও নেহ পদার্থ থাকে, সেসব খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। যেসব খাদ্যে পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে, সেসব খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ক্যালরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিচের সারণিটি দেখ। এতে কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

উচ্চ ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্য	নিম্ন ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্য
ভোজ্যতেল	চাল কুমড়া
ঘি	বাঁধাকপি
মাখন	বিঙা
মাছের তেল	শালগম
ঘন নারকেলের দুধ	টমেটো
মাখন তোলা গুঁড়া দুধ	ডঁটা
ভাজা চিনা বাদাম	লাউ
চিনি	পালংশাক
মধু	কলমি ডঁটা
খেজুরের গুড়	মূলা
ছোলার ডাল	ওলকপি
সয়াবিন	ধূন্দল
শিমের বিচি	পটল

প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপশক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

কাজ : তোমার এলাকায় পাওয়া যায় এমন সব কম ক্যালরিয়ুক্ত ও বেশি ক্যালরিয়ুক্ত খাবারের নমুনা ও তালিকার একটি চার্ট তৈরি করো।

নতুন শব্দ : ক্যালরি, থার্মিজ স্নেহ ও উড়িজ স্নেহ।

পাঠ-৬ : ভিটামিন

খাদ্যে অতি সামান্য মাত্রায় এক প্রকার জৈব পদার্থ আছে, যা প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। আমরা প্রতিদিন যেসব খাদ্য (যেমন-চাল, আটা, বাদাম, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল) খাই এর মধ্যেই ভিটামিন থাকে। ভিটামিন আলাদা কোনো খাদ্য নয়।

অনেক দিন ধরে দেহে কোনো ভিটামিনের অভাব ঘটলে নানা রকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।



চিত্র ১৩.৪ : কয়েকটি ভিটামিনসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল

আমাদের দেহে ভিটামিনের ভূমিকা অপরিহার্য। আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলোর একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। ছকে যে সমস্ত খাদ্যে ভিটামিন আছে তাদের নাম, উৎস, ভিটামিন গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও বিবরণ দেওয়া হলো।

ভিটামিন	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ভিটামিন -এ দেহে জমা থাকে	কলিজা, ডিম, মাখন, পনির, মাছ, টটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, আম, কাঁঠাল ও পাকা পেঁপে।	দেহের বৃক্ষি, দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধে।
ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স (বেশ কয়েকটি ভিটামিন একত্রে গঠিত। দেহে জমা থাকে না।)	ডিম, কলিজা, বৃক্ষ, মাংস, দুধ, গম, লাল চাল, পনির, শিম ও বাদাম।	দেহের বৃক্ষি, হৃদপিণ্ড, ম্লায় এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুস্থ কাজ সম্পাদনে, চামড়ার স্থায় রক্ষায়।
ভিটামিন -সি (রক্ষনে অথবা মজুদ রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। দেহে জমা থাকে না।)	লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা, জামুরা, টমেটো, কচুশাক, কলমিশাক ও সবুজ শাক-সবজি।	সুস্থ-স্বল হাড়, দাঁত, দাঁতের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে।
ভিটামিন-ডি (দেহে জমা থাকে)	দুধ, মাখন, ডিম এবং মাছের তেল (সুর্ঘের আলোতে আমাদের শরীরের চামড়া এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে)।	দেহকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে বা সুস্থ-স্বল হাড় ও দাঁত গঠনে প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : ভিটামিন ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।

পাঠ-৭ : খনিজ লবণ ও পানি

রহিমন গলগঙ্গ, সাহিদা রক্ষস্বল্পতায় ভুগছে- এরা কেন এসব রোগে ভুগছে? খনিজ লবণের অভাবে তাদের দেহে এসব রোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভাত ও তরকারির সাথে আমরা লবণ খাই। তাছাড়াও আমাদের দেহের জন্য আরও কয়েক প্রকার লবণ প্রয়োজন হয়। দেহ কোষ ও দেহের তরল উপাদানের জন্য (যেমন- রক্ত, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি) খনিজ লবণ খুবই দরকারি। খনিজ লবণ দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- পেশি সংকোচন, ম্লায় উত্তেজনা) নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। হাড়, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

উক্তি মাটি থেকে সরাসরি খনিজ লবণ শোষণ করে। আমরা প্রতিদিন যে শাকসবজি, ফলমূল খাই এই সমস্ত খাবার থেকে আমরা প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। আমাদের দেহের ওজনের ১% পরিমাণ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো হলো ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্রেসিন ও ম্যাগনেসিয়াম। এছাড়া লোহা, আয়োডিন, দস্তা, তামা ইত্যাদি খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য অতি সামান্য পরিমাণে দরকার। এগুলোর অভাব ঘটলে দেহে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আয়োডিনের অভাবে গলগঙ্গ রোগ হয়। খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশিয়ে আয়োডাইড লবণ তৈরি করা হয়। গলগঙ্গ রোধে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণগুলো নিচের ছকে দেওয়া আছে। কোন কোন খাদ্যে এগুলো পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণও এই ছকে আছে।

খনিজ লবণ	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ক্যালসিয়াম	দুধ, মাংস ও সবুজ শাকসবজি।	দাঁত ও হাড়ের সুস্থিতায়, রক্ত জমাট বাঁধতে ও যায় ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।
ফসফরাস লবণ	দুধ, মাংস, ডিম, ডাল ও সবুজ শাকসবজি।	সুস্থ দাঁত ও হাড়ের জন্য।
লোহা	মাংস, ফল ও সবুজ শাকসবজি।	রক্তের লালকণিকা বৃদ্ধি করে রক্তবস্তুতা দূর করে।
আয়োডিন	সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল।	থাইরয়েড গ্রাহির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে গলগণ রোগ মুক্ত রাখে।
সোডিয়াম	সাধারণ লবণ, নোনা ইলিশ, পলির ও নোনতা বিস্কুট।	দেহের অধিকাংশ কোষে এবং দেহরসের জন্য এর স্বল্পতা দেহে আড়ষ্ট ভাব আনে।
ম্যাগনেসিয়াম	সবুজ শাকসবজি।	এনজাইম বিক্রিয়া ও দাঁতের শক্ত আবরণ গঠনে ভূমিকা রাখে।
ক্লোরিন	খাবার লবণ	দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করা।
পটাসিয়াম	মাছ, দুধ, ডাল, আখের গুড় ও শাকসবজি।	পেশি সংকোচনে ভূমিকা রাখে।

পানি

পানি খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরই পানির স্থান। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক দিনও বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহের দুই-তৃতীয়াংশ হলো পানি।

পানি দেহের গঠন, অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাক ও শোষণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানির কারণে রক্ত তরল থাকে, যা রক্ত সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানি দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে। পানির আরও একটি প্রধান কাজ হলো মলমুক্তের সাথে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করা। পানির অভাবে কোষ্টকাঠিন্য দেখা দেয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই আমাদের নিয়মিত পরিমাণ মতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।

রাফেজ : শস্যদানা, ফল ও সবজির কিছু অংশ যা হজম বা পরিপাক হয় না এমন তঙ্গময় বা আঁশযুক্ত অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ সেগুলোজ নির্মিত কোষ থাচীর ছাড়া আর কিছুই নয়। রাফেজ হজম হয় না। রাফেজ পরিপাকের পর অপরিবর্তিত থাকে। এই অপরিবর্তিত রাফেজ মানবদেহে মল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১১ নতুন শব্দ : রাফেজ ও এনজাইম।

পাঠ-৮ : সুষম ও অসুষম খাদ্য

জয়া ও জিতু দুই বন্ধু। ওরা দুজনই ঘৰ্ষণিতে পড়ে। জয়া শারীরিকভাবে দুর্বল এবং এই কারণে পড়ালেখায় অমনযোগী। সবসময় ওকে মনমরা দেখায়। প্রাই অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। জিতু একদিন জয়াদের বাড়িতে বেড়াতে গেল। সে জয়ার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারল জয়া নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে না। সে যেটুকু খাবার খায় তাতে ভাত, মাছ ও মাংসের পরিমাণ থাকে সামান্য। ডিম, দুধ, ফল-মূল ও শাকসবজি একেবারেই খায় না। মাজোর করেও ওগুলো তাকে খাওয়াতে পারেন না। মা ওকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাহলে বলোতো জয়ার খাবার তালিকাটি কি সঠিক? সে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় সামান্য পরিমাণ। অন্যান্য খাবার না খাওয়ায় ওর দেহে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ ওর খাবার তালিকাটি সুষম নয়। কারণ যে খাবার তালিকায় সব কয়টি খাদ্য উপাদান থাকে না, সেটি সুষম খাদ্যের তালিকা নয়।

সুষম খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি? সুষম খাদ্য বলতে আমরা সেই সকল খাবার বুঝি, যাতে প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। অর্থাৎ প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও পানি দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে থাকে। সুষম খাদ্য খেতে হলে আমাদের খাদ্য তালিকায় শর্করা, প্রোটিন, তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন ও খনিজ লবণের উপাদান থাকা আবশ্যিক।

জয়া যে খাবার খাচ্ছে তা সুষম না হওয়ায় দেহের বৃদ্ধি ঘটছে না, কাজে শক্তি পায় না। দুর্বল বোধ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

অসুষম খাদ্য : খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানের যে কোনো একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকে অসুষম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের খাদ্যই অসম। সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই শর্করা। খাদ্যে প্রোটিন, শর্করা, খনিজ লবণ এবং ভিটামিন পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। অর্থাৎ দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি।

স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। যথা-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি খেতে হবে।
- মাছ বেশি খেতে হবে।
- মিষ্টি ও তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
- লবণ কম খেতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে স্থানীয় সহজলভ্য বিভিন্ন খাদ্য সংগ্রহ করবে। সংগ্রহিত খাদ্য উপাদানগুলো শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- খাদ্য তিন থকার।
- খাদ্য উপাদান ছয় থকার।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এ উপাদানগুলো শাকসবজি ও ফলমূলের মধ্যে থাকে।
- অতিরিক্ত প্রোটিন বা শ্বেতসার খাওয়া উচিত নয়।
- সুষম খাদ্য আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন।
- খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক কিলোক্যালরি। প্রতিদিন কার কত তাপশক্তি বা ক্যালরি প্রয়োজন তা নির্ভর করে বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

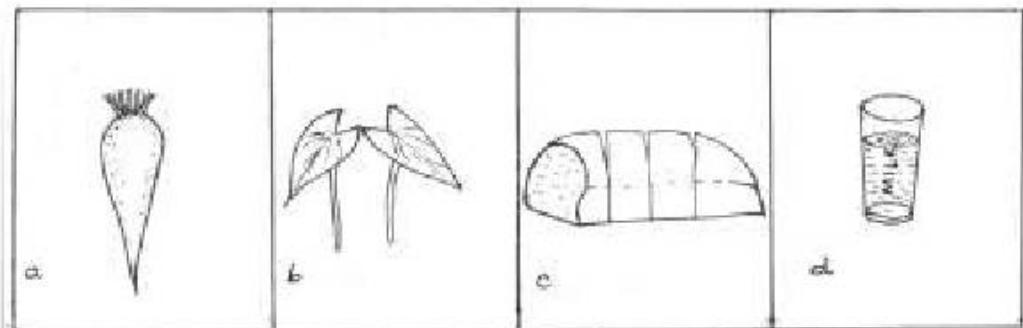
১. কোনটি মুখের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ভিটামিন এ | খ. ভিটামিন সি |
| গ. ভিটামিন ডি | ঘ. ভিটামিন ই |

২. কোনটি প্রাণিজ আমিষ?

- | | |
|----------|--------|
| ক. ডাল | খ. দুধ |
| গ. বাদাম | ঘ. ঘি |

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. উপরের কোন খাদ্যে মেহ উপাদান তুলনামূলকভাবে বেশি?

- | | |
|------|------|
| ক. a | খ. b |
| গ. c | ঘ. d |

৪. পরিপাক নালি পরিকারে ভূমিকা রাখে-

- i. a
- ii. b
- iii. c

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।



A.



B.



C.



D.

ক. খাদ্য কাকে বলে?

খ. রাফেজ পুষ্টি উপাদান না হলেও দেহের জন্য প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. D চিহ্নিত খাদ্যটি বেশি খেলে কি সমস্যা হবে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুষম খাদ্য হিসেবে উদ্দীপকের খাদ্যগুলোর উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো।

২. মাহি ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। সে একেবারেই শাকসবজি খেতে চায় না। কিছুদিন ধরে সার্দি-কাশি ও জ্বরে ভুগছে। কয়েক দিন ঘাবৎ সে রাতে ভালো দেখতে পায় না। তার বাবা-মা চিকিৎসা হয়ে পড়লেন। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিলে ডাক্তার তার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ডাক্তার তার মাকে মেয়ের চোখে কম দেখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং রাতিন শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. সুষম খাদ্য কাকে বলে?

খ. দুধ কোন ধরনের খাদ্য? ব্যাখ্যা করো।

গ. মাহির স্বাস্থ্যগত সমস্যাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মাহির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য করণীয়সমূহ যুক্তিসহ আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। খাদ্য তালিকায় লোহা উপাদানের প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।
- ২। আমরা খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- ৩। মানুষ শুধু ভাত খেরে বাচ্চতে পারে না কেন? ব্যাখ্যা করো।
- ৪। পানি আমাদের দেহে দ্রাবক রসে কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন

তোমরা জান, আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই এই পরিবেশ। একটি স্থানের সকল জড় ও জীব নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ তুষি দেখতে পাবে। পরিবেশের এই বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবও বিভিন্ন ধরনের হয়। তোমরা জান জীবের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। একটি পরিবেশে কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করবে তা নির্ভর করে সেখানকার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপরে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবকে প্রভাবিত করে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ - ১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

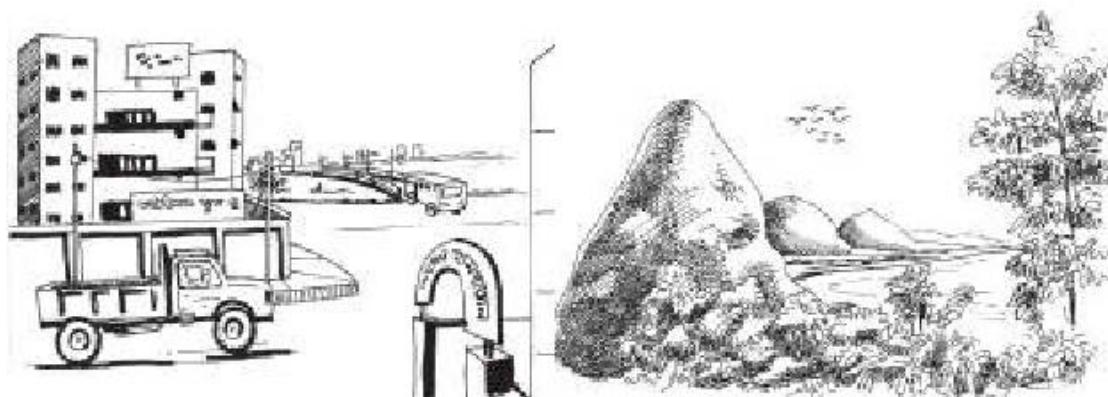
আমাদের চারপাশের পরিবেশ লক্ষ কর। দেখবে পরিবেশের কিছু জিনিস মানুষ তৈরি করেছে। আবার কিছু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি। অর্থাৎ যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না। তাহলে কোনটিকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলব ?

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো নিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এর মধ্যে জড় বস্তু ও জীব দুটোই রয়েছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।

মানুষ তার ধ্রুবজনে ঘর-বাড়ি, বাস-ট্রাক, মৌকা, রাস্তাঘাট, সেতু, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে। এগুলো মানুষের তৈরি পরিবেশ নামে পরিচিত।

তোমরা নিচ্যাই লক্ষ করেছ, আমাদের চারপাশের পরিবেশে আরও কিছু বস্তু আছে যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। যেমন- চাঁদ, তারা, মাটি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি। এগুলো সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান।

কাজ : তোমার বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে বিদ্যালয়ে পৌছা পর্যন্ত আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের তৈরি এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো শনাক্ত করে এগুলোর নাম তোমার নোট খাতায় লিখে রাখ। শ্রেণিতে আলোচনা করো।

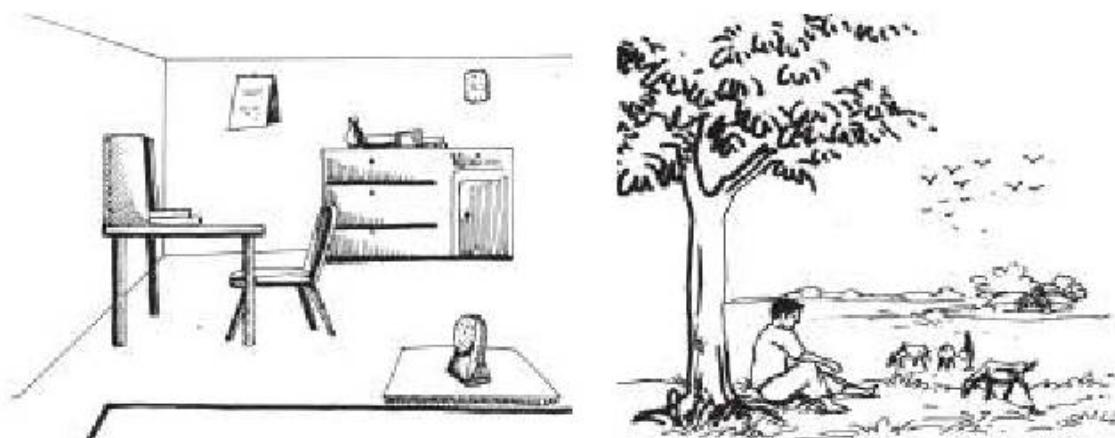


চিত্র ১৪.১ : মানুষের তৈরি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। যেমন : বনজঙ্গলের পরিবেশ, পাহাড়-পর্বতের পরিবেশ, নদীর পরিবেশ ইত্যাদি। তোমার দেখা বা জানা এ ধরনের আর কী কী প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে?

পাঠ - ২ : পরিবেশের উপাদান

পরিবেশকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো পরিবেশের সকল সজীব উপাদান, যা জীব উপাদান নামে পরিচিত। এই জীব উপাদানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল উপাদান নিয়ে আর একটি পরিবেশ গঠিত। যাকে বলা হয় জড় পরিবেশ বা জীব পরিবেশ।



চিত্র ১৪.২ : জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ

কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন করো। ক্লিনের মাঠে যাও। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করো। জড় পরিবেশ এবং জীব পরিবেশের উপাদানগুলো শনাক্ত করে নোট খাতায় লেখো। দলে আলোচনা করো। পোস্টার পেপারে ছক তৈরি করো। জড় ও জীব উপাদানগুলোর নাম ছকে লেখো। শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

জীব পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। পরিবেশের প্রাণহীন সব উপাদান নিয়ে জড় পরিবেশ গঠিত। এগুলো অজীব বা জড় উপাদান নামে পরিচিত। জড় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি এবং বায়ু। কারণ এ উপাদানগুলো ছাড়া কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না।

পাঠ ৩-৪ : পরিবেশের জড় ও জীব উপাদান

কাজ : নিচে দেওয়া ছকটি খাতায় তুলে নাও। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে তোমার জানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা নিখে ছকটি পূরণ করো। শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করো।

ছক

পরিবেশের উপাদান	উদ্ভিদের কী কাজে লাগে	প্রাণীর কী কাজে লাগে
মাটি		
পানি		
বায়ু		

মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা, অর্দ্রতা, জলবায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন অজীব উপাদান বিভিন্নভাবে পরিবেশের প্রতিটি জীবের স্বতাব এবং বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। এসব উপাদানের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে, পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন ধরনের জীব উপাদান থাকবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, অজীব বা জড় উপাদান জীবের বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : পাঠ ১-এ তোমার তোমাদের স্কুলের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে জীব পরিবেশের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত করেছ সেগুলো কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে বা বাস করে তা পর্যবেক্ষণ করো। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের পরিবেশের পার্থক্য লক্ষ করো। নিচের ছকটি পোস্টার কাগজে বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনে তুলে ছকটি পূরণ করো। এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন করো।

ছক

জীবের নাম	কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে / আবাসস্থল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

তোমার আশেপাশের পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

পরিবেশে জীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকে তা কী কখনও ভেবেছ?

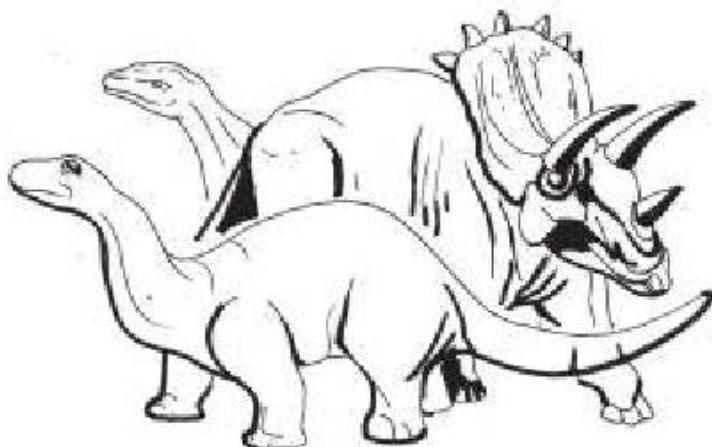
কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন করো। পোস্টার কাগজ নাও। দুটো ভিন্ন পরিবেশের (যেমন বনজঙ্গল এবং মরুভূমির পরিবেশ) নাম পোস্টার কাগজে লেখো। তোমরা যে দুটো পরিবেশের নাম পোস্টার কাগজে উল্লেখ করেছ, সে পরিবেশে কোন কোন উদ্ধিদ ও প্রাণী বাস করে, সেগুলো আর একটি পোস্টার কাগজে নামসহ চিত্র এঁকে কঁচি দিয়ে কাটো। এসব উদ্ধিদ ও প্রাণী তোমার উল্লিখিত দু'টি পরিবেশের মধ্যে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে আঠা দিয়ে লাগাও। শেণিতে বুলেটিন বোর্ড অথবা দেয়ালে প্রদর্শন করো। সব দল ঘুরে ঘুরে দেখবে ও শেণিতে আলোচনা করবে।

পরিবেশের সকল উদ্ধিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য উদ্ধিদের প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য ও সূর্যের আলো। শক্ত থেকে এদের আত্মরক্ষাও প্রয়োজন। প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য, তাপমাত্রা এবং বাসস্থান। প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য শক্ত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তোমাদের দেখা সকল পরিবেশের উদ্ধিদ ও প্রাণী এক রকমের নয়। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে উদ্ধিদ ও প্রাণীর বসবাস। সমতল ভূমি থেকে আরম্ভ করে পাহাড়, মাটির নিচে, বনজঙ্গল, খাল-বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি ইত্যাদি সকল স্থানেই বিভিন্ন উদ্ধিদ জন্মে ও প্রাণী বাস করে। জলবায়ু, মাটি, পানি, আলো ও অন্যান্য উপাদানের ভিন্নতার কারণে এ সকল অঞ্চলের উদ্ধিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যও ভিন্ন।

পাঠ ৫-৬ : পরিবেশের ভারসাম্য

পরিবেশে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য জীব বিভিন্নভাবে তার চারপাশের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বেঁচে থাকার জন্য আমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করি। তবে দেখতো যে সকল উৎস থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাই তা যদি কোনো কারণে নষ্ট হয় তবে আমাদের জীবনে কী ঘটবে?

তোমরা ডাইনোসরের নাম শনেছ, যা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। তোমরা কি জান, কেন এই ডাইনোসর আজ আর পৃথিবীতে নেই?



চিত্র ১৪.৩ : বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর

ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, ডাইনোসর যখন পৃথিবীতে ছিল তখন পৃথিবী অনেক গরম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই পৃথিবী অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে তারা সবাই মারা যায়।

আবার কারো কারো মতে, যখন পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা খাদ্য হিসেবে ডাইনোসরের ডিম খাওয়া শুরু করে। ডাইনোসর তাদের ডিম সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। ফলে ধীরে ধীরে তাদের বিলুপ্তি ঘটে। তবে এ সংক্রান্ত গবেষণায় দুটি প্রধান তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে: (১) গ্রহণুর আঘাত এবং (২) আগ্নেয়গিরি উদগীরণ।

(১) ১৯৮০ সালে পদার্থবিদ লুইস আলভারেজ এবং তার দল আবিষ্কার করেন যে, ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে ব্যাপক হারে ইরিডিয়াম (একটি মহাজাগতিক মৌল) জমে ছিল, যা একটি গ্রহণু আঘাতের ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তী সময়ে মেঝিকোতে একটি ১১১ মাইল প্রশস্ত গর্ত আবিস্কৃত হয়, যেটিকে সেই গ্রহণুর আঘাতস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গবেষণা বলছে, এই আঘাত পৃথিবীর জলবায়ুতে আকস্মিক পরিবর্তন এনে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেয়। হঠাৎ সংঘটিত এই পরিবর্তন ডাইনোসরের ব্যাপক বিলুপ্তির কারণ হয়।

(২) অন্য একটি তত্ত্ব অনুযায়ী, আগ্নেয়গিরি উদগীরণই ছিল প্রধান কারণ। এই তত্ত্বে বলা হয়, ডাইনোসরের আগে থেকেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছিল এবং আগ্নেয়গিরির উদগীরণ একে তুরাস্তি করে। আগ্নেয়গিরির গ্যাস ও ছাই পরিবেশে বিষ্ট্রিয়া সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন ঘটায়। ফলে বিরূপ পরিবেশে ডাইনোসরদের ঠিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে এবং বিলুপ্ত হয়।

আবার অনেক বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর পরিবেশে তখন এমন সব পরিবর্তন ঘটে, যার সাথে ডাইনোসরের নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুবতে পারছ, প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশের পরিবর্তন বা মানুষের কোনো কর্মকাণ্ডের কারণে যদি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে জীব পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ কী কী? নিচের কাজটি সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এর উত্তর খুঁজে বের করো।

কাজ : তোমার এলাকার বা ক্ষেত্রের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ (এই পরিবেশ হতে পারে কোনো সমতল ভূমি, কোনো পুকুর বা জলাশয় বা কোনো বনাঞ্চল)। দেখো এখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে কী? পরিবর্তন ঘটার কারণ কী কী? তোমার নেট খাতায় লেখো। এতে মানুষসহ উদ্ভিদ বা কোনো প্রাণীর কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? হয়ে থাকলে সেগুলো নেট খাতায় উল্লেখ করে রাখো। শ্রেণিতে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করো।

বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বনজঙ্গল কেটে বাড়িয়ার, চাষের জমি, ক্ষেত্র, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এ ছাড়াও মানুষ বিভিন্নভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত করছে। ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে নষ্ট না করে একে সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে।

পাঠ ৭-৮ : পরিবেশের উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক এবং পারম্পরিক নির্ভরশীলতা

পরিবেশের সকল অজীব বা জড় উপাদানের সাথে জীব উপাদানসমূহের সবসময়ই পারম্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। এমনকি জীব পরিবেশে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, তাদের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কোন অংগলের জীব উপাদান ও জড় উপাদানের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে নাম বাস্তুতত্ত্ব বা ইকোসিস্টেম।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো তিমি- এটা তোমরা জান। আর শুন্দরতম হলো ব্যাকটেরিয়া। বড় থেকে শুন্দর সকল জীবই কিন্তু পরম্পরার পরম্পরার সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত।

পরিবেশের উদ্ধিদ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক আছে। এদের সাথে আবার বায়ু, মাটি ও পানির যে সম্পর্ক তা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। এর মধ্যে কোনো প্রক্রিয়া অতি সাধারণ, আবার কোনোটি অতি জটিল।

কাজ : তোমার নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ধিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করো। পর্যবেক্ষণের সময় খেয়াল করো। বিভিন্ন উদ্ধিদ ও প্রাণী পরিবেশে কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আরও খেয়াল করো। উদ্ধিদ ও প্রাণী কীভাবে পরিবেশের অজীব উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং তোমার নেট খাতায় লিখে রাখো। অজীব ও জীব উপাদানের নির্ভরশীলতার প্রবাহচিত্র পোস্টার কাগজে একে শ্রেণিতে প্রদর্শন করো।

জীব জড়ের উপর নির্ভরশীল, আবার একটি জীবের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তোমরা এ বিষয়টি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন উদ্ধিদ খাদ্য তৈরির জন্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়, যা সালোকসংশ্লেষণ নামে পরিচিত। সালোকসংশ্লেষণ (উদ্ধিদ) এবং শ্বসন (উদ্ধিদ এবং প্রাণী) পদ্ধতি পরিবেশের বিভিন্ন অজীব ও জীবের পারম্পরিক সম্পর্কের প্রধান দুটি উপায়।

উদ্ধিদ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে ফুকোজ এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন উদ্ধিদ এবং প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগে। প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ধিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এভাবেই সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবমণ্ডলের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

তোমরা জেনেছ, জীব পরিবেশের প্রধান উপাদান হলো উদ্ধিদ ও প্রাণী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা একে অপরের থেকে ভিন্ন। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।



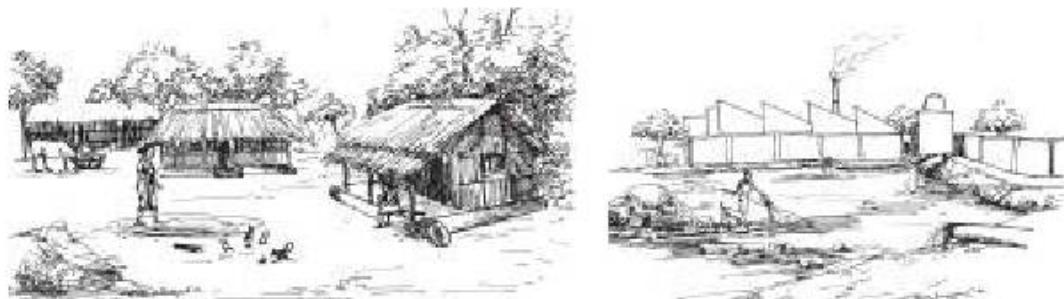
চিত্র ১৪.৪ : উদ্ধিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

কোনো কোনো উদ্ভিদের বৎসরিতার ঘটে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে। জীবন ধারণের জন্য মৌমাছি যখন ফুলে ফুলে বিচরণ করে, তখনই পরাগায়ন ঘটে। আবার বিভিন্ন প্রাণী যেমন পশু পাখি ইত্যাদির মাধ্যমেও উদ্ভিদের বৎসরিতার হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যারা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল। তোমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নির্ভরশীলতার অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। এরকম আরও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উদাহরণ তৈরি কর।

পাঠ ৯-১০ : পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের কৌশল

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা জেনেছ। আরও জেনেছ উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এরা আবার জড় পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে যদি কোনো কারণে কোনো পরিবর্তন ঘটে, তবে জীবের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। বলতে পার কীভাবে পরিবেশের দৃষ্টি ঘটে?

কাজ : শিক্ষকের নির্দেশনায় দলে একটি দৃষ্টিতে পরিবেশ (যেমন : হাজামজা পুকুর বা জলাশয়, দৃষ্টিত নদী, আবর্জনাময় স্থান ইত্যাদি) পরিদর্শন করো। পরিবেশ দৃষ্টিত হওয়ার কারণ শনাক্ত করো। দৃষ্টণরোধে করণীয় কী তা ব্যাখ্যা করো। পরিবেশের উপাদানসমূহ সংরক্ষণে করণীয় কী দলে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করো। শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।



চিত্র ১৪.৫ : একটি স্বাভাবিক পরিবেশ ও একটি দৃষ্টিতে পরিবেশ

সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষণ করতে হলে পরিবেশকে দৃষ্টগুরুত্ব দেওয়া হবে। সেই সাথে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মাটি, পানি, বায়ুর দৃষ্টি রোধ করতে হবে। বনজঙ্গল, পশু, পাখি নিধন বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যেন জীব এবং সম্পদের ভারসাম্য রক্ষণ হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো এমন একটি পরিবেশ, যার মধ্যে রয়েছে জড় বন্ধ ও জীব, যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না।
- পরিবেশ দৃষ্টি ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত। জড় উপাদান ও জীব উপাদান। প্রাণীর সব উপাদান হলো জড় উপাদান এবং সজীব সকল উপাদান হলো জীব উপাদান।
- বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার ও ধ্বংস করা হচ্ছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ।
- পরিবেশের সকল জড় উপাদান ও জীব উপাদানের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। একই ভাবে সকল জীবের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য সকল জীব একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

- সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দূষণমুক্ত রাখতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অজীব উপাদান?

- | | |
|-------------|----------|
| ক. অ্যামিবা | খ. পানি |
| গ. গোলাপ | ঘ. শামুক |

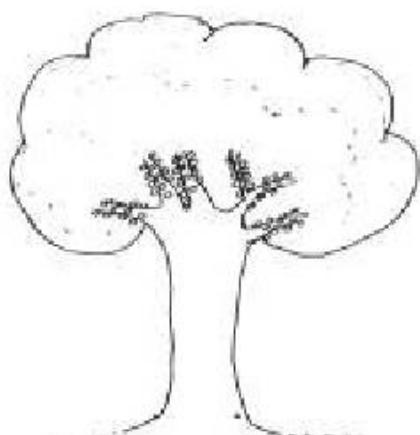
২. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমাদের-

১. রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে
- ii. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে
- iii. উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে রক্ষা করতে হবে

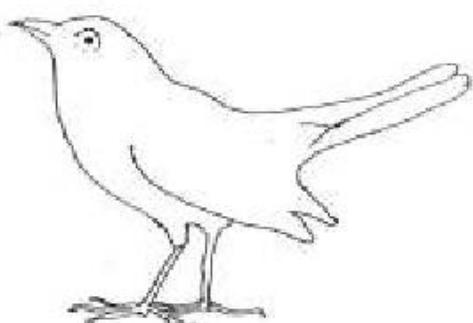
নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ii ও iii |

নিচের উদ্দীগকের আলোকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র X



চিত্র Y

৩. কিসের জন্য X এর উপর Y নির্ভর করে?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ক. সালোকসংশ্লেষণ | খ. খাদ্যসংগ্রহণ |
| গ. পরাগায়ন | ঘ. প্রশ্বেদন |

8. X ও Y প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে-

- i. পানির উপর
 - ii. বায়ুর উপর
 - iii. আলোর উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

২। নিচের উদ্ধীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও।

X	Y	Z
মাটি		
পানি		
বায়ু		
আলো	ধানগাছ	মানুষ

ক. দুষ্পণ কাকে বলে?

খ. শহুরে কাঠবিড়লি কম দেখা যায় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. X কলামের উপাদানগুলোর উপর Y কলামের জীব কীভাবে নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পরিবেশের ভারসম্য রাষ্ট্রায় ২ এর ভমিকা বিশ্লেষণ করো।

২. P একটি বৃক্ষচারী তৃণভোজী প্রাণী। জীবনধারণের জন্য এটি তার চারপাশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে তবে মানুষের কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে প্রাণীটির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই কারণে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণে আমদের অনেক সচেতন হতে হবে।

ক. জড় পরিবেশ কাকে বলে?

খ. সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রবাল কর্মে যাওয়ার কারণ ঘোষ্য করে।

গ. P প্রাণীটি পরিবেশের কোন জীবের উপর অধিক নির্ভর করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্ধিপক্রের শেষে উল্লিখিত সচেতনতার কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পরিবেশ দ্ব্যবস্থামুক্ত রাখা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

২। সালোকসংশ্লেষণ ও শুসন কিভাবে জীবমন্ডলে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃহাপন করে ব্যাখ্যা করো।

৩। মৌমাছি ফুলের কি ধরণের সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো।

৪। থাণী খাদ্যের জন্য উক্তিদের উপর নির্ভরশীল কেন? ব্যাখ্যা করো।

বিজ্ঞান

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি : বিজ্ঞান

মিতব্যযী হওয়া ভালো ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।